بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

রেজি নং ডি.এ. ১৪২

مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

৩য় পর্ব
৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

জুলাই ২০২৪ ঈসায়ী
জিলহজ্জ-মুহাররম ১৪৪৫-৪৬ হিজরী
আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪৩১ বাংলা

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক

প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী

সহযোগী সম্পাদক

শাইখ মুফাযযল হুসাইন মাদানী

প্রবাস সম্পাদক

শাইখ মুহাম্মাদ আজমাল হুসাইন বিন আবদুর নূর

ব্যবস্থাপক

চৌধুরী মু'মিনুল ইসলাম

সহকারী ব্যবস্থাপক

মো : রমজান ভূঁইয়া

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রফেসর এ.কে.এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ডক্টর দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ডক্টর মো. লোকমান হোসেন

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন
ডক্টর মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন
শাইখ আবদুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী
শাইখ ইসহাক বিন ইরশাদ মাদানী

সম্পাদক
০১৭১৬-১০২৬৬৩
সহযোগী সম্পাদক
০১৭২০-১১৩১৮০
ব্যবস্থাপক :
০১৯১৬-৭০০৮৬৬

যোগাযোগ : মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৪৩৪ মোবাইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
ই-মেইল : tarjumanulhadeethbd@gmail.com
www.jamiyat.org.bd
www.ahlahadith.net.bd
https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth/

সার্কুলেশন বিভাগ :
০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
বিকাশ :
০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮

মূল্য : ২৫/- [পঁচিশ টাকা মাত্র]

মাসিক
তর্জুমানুল হাদীস
مجلة ترجمان الحديث الشهرية
مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র
কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক
রেজি নং ডি.এ. ১৪২

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث بنغلاديش، ٩٨ شارع نواب فور، داكا-١١٠٠ الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠١٧١٦١٠٢٦٦٣
المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي رحمه الله، المشرف العام للمجلة: الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق، رئيس التحرير: الأستاذ الدكتور أحمد الله تريشالي، مساعد التحرير: الشيخ مفضل حسين المدني.

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায় (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষান্মাষিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ	৩৬০/-	১৮০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২০ ইউ.এস. ডলার	১০ ইউ.এস. ডলার
সাউদী আবর, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	২৫ ইউ.এস. ডলার	১২ ইউ.এস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	২২ইউ.এস. ডলার	১১উ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড সহ পশ্চিমা	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৮ ইউ.এস. ডলার

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০, ০০০/-
শেষ প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	২৫০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	১২০০/-

সূচীপত্র

দারসুল কুরআন
❖ **আশুরায়ে মুহাররম ও প্রচলিত কুসংস্কার**।..... ৩
শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী

দারসুল হাদীস
❖ **সম্মনিত মাস মুহাররমে করণীয় ও বর্জনীয়**।.....৭
শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা

সম্পাদকীয়
❖ **১৪৪৬ হিজরী সন শুরু হতে যাচ্ছে**..... ১২

প্রবন্ধ :
❖ **দাওয়াত ও তাবলীগী ইজতেমা ২০২৪ বাইপাইল**.....১৩
শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী
❖ **যুক্তিবাদের অজ্ঞতা সংশয় ও সমাধান**।.....১৬
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব
❖ **পুরুষদের জন্য কাতারের পেছনে একাকী সলাত হবে না**..২০
ইবনু আকবার
❖ **মানবজীবনে তাক্বওয়ার গুরুত্ব, মুত্তাকীদের**.....২৩
আবু মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ
❖ **তাজিকিস্তানে মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর**.....২৬
শেখ আহসান উদ্দিন
❖ **ন্যায় বিচারের একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত**।.....২৯
অধ্যাপক আবুল খায়ের
❖ **প্যারেন্টিং : অভিভাবকের দায়িত্ব**। ৩১
মীযান মুহাম্মদ হাসান
❖ **মহিয়সী নারী হাজেরা** । ৩৩
সাইদুর রহমান

শুব্বান পাতা
❖ **'সফলতা'**।.....৩৭
রিফাত সাঈদ
❖ **নারীর ডিজিটাল পর্দা ও পুরুষের স্বীয় পর্দায় উদাসীনতা**।.....৩৯
সুরাইয়া বিন মামূনুর রশীদ
❖ **ফাতাওয়া ও মাসায়েল**।.....৪২

দারসুল কুরআন/ من دروس القرآن

আশুরায়ে মুহাররাম ও প্রচলিত কুসংস্কার

শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী❖

আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ﴾

আয়াতের সরল অনুবাদ : "হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা কাফিরদের অনুসরণ কর তাহলে তারা তোমাদেরকে পেছনে ফিরিয়ে দিবে, ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বরং আল্লাহই তোমাদের প্রকৃত অভিভাবক এবং তিনিই সর্বোৎকৃষ্ট সাহায্যকারী।"[১]

আয়াত অবতরণের প্রেক্ষাপট :

আলোচ্য আয়াত দু'টি সূরা আলে ইমরানের অন্তর্গত। সূরা আলে ইমরান মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। মদীনায় ইয়াহুদী ও মুনাফিক সমাজ মুসলমানদেরকে বিভিন্ন কলাকৌশলে কুফরির দিকে নেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকত। ফলে আল্লাহ তা'আলা ঈমনদারদেরকে অত্র আয়াতে সতর্ক করেছেন, যেন তারা ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের অপকৌশলে পতিত না হয়। বরং ঈমানদারদের প্রকৃত বন্ধু ও সাহায্যকারী হলেন আল্লাহ তা'আলা, তাই তাদের উচিত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা।

আয়াতের আলোচ্য বিষয় : আলোচ্য আয়াতে দুটি বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে :

(১) অমুসলিম তথা ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান, মুশরিক ও কাফিরদের অনুসরণ-অনুকরণ ঈমানদারকে কুফরীর দিকে নিয়ে যাবে, ফলে ঈমান হারিয়ে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(২) ঈমানদারের প্রকৃত অভিভাবক ও সাহায্যকারী হলেন আল্লাহ তা'আলা, তাই একনিষ্ঠভাবে শুধু তাঁরই আনুগত্য স্বীকার করতে হবে।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা বলেন : হে ঈমাদারগণ যদি তোমরা কাফিরদের আনুগত্য কর ...। মূলত ঈমান ও কুফর দু'টি বিপরীতমূলক এবং সাংঘর্ষিক। অতএব কখনই এ দু'টি একত্র হতে পারে না। একটিকে স্থান দিলে অপরটি বিদায় নিবে। যারা ঈমানকে স্থান দিয়েছে তাদের কাছ থেকে কুফর বিদায় নিয়েছে, এমতাবস্থায় যদি আবার কুফরের স্থান দেয়া হয় তাহলে অবশ্যই ঈমান বিদায় নেবে। আর ঈমানদারের ঈমান বিদায় নেয়া হল ইহকাল ও পরকালে সর্বোচ্চ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।

কাফিরদের অনুসরণ বর্তমান প্রেক্ষাপটে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুসলিমরা ঈমান-ইসলামে দুর্বল হয়ে যাওয়ায় শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বভাব-সভ্যতা ও বেশ-ভূষা সকল ক্ষেত্রে তারা পরমুখী হয়ে গেছে, এ সুযোগে ইসলামের শত্রু ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান, মুশরিক ও কাফির সকলেই স্বীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি, স্বভাব-সভ্যতা ও বেশ ভূষার অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে মুসলিমদের মাঝে। এসবের অনুসরণের মাধ্যমেই মুসলিম সমাজ কাফিরদের অনুসারী বনে যাচ্ছে, শেষ পর্যায়ে নিজের ঈমান-ইসলামকে হারিয়ে সর্বহারা হয়ে যাচ্ছে। অমুসলিমরা তাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিস্তারের জন্য সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করছে মুসলিম সভ্যতার বিভিন্ন মৌসুমকে। আশুরা মুহার্রম একটি গুরত্বপূর্ণ মৌসুম, যার আলোচনা আয়াতের ব্যাখ্যার পরই আসবে ইনশা আল্লাহ।

বরং আল্লাহই তোমাদের প্রকৃত অভিভাবক ...। অমুসলিম যারা আজ ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতির স্লোগান গাইছে প্রকৃতপক্ষে তারা মুসলিমদের সাহায্য সহানুভূতি ও কল্যাণ চায় না, তারা চায় মুসলিমদের ওপর নিজেদের মোড়লগিরী প্রতিষ্ঠিত করতে এবং মুসলিমদের জন্য প্রকৃত পক্ষে যিনি সাহায্যকারী ও কল্যাণকামী তিনি হলেন আল্লাহ তা'আলা। তাই মুমিনদের অপরিহার্য কর্তব্য হলো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ওপরই আস্থাশীল হওয়া এবং শুধু তাঁরই আনুগত্য করা। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন, আমীন।

❖ সেক্রেটারী জেনারেল- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

[১] সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৪৯-১৫০

হে মুসলিম হুঁশিয়ার!

দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, আজ মুসলিম সমাজে বিশেষ করে যুব সমাজ ইসলামী উৎসব পালন করছে অমুসলিমদের নীতিতে, ঈদ হচ্ছে গান-বাজনা, নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ, টিভি, সিনেমা ইত্যাদিতে নগ্ন হওয়ার মিলনমেলা। কোনো সন্দেহ নেই এ হলো ইসলামের শত্রুদের এক গভীর ষড়যন্ত্র, যার মাধ্যমে তারা মুসলিম সমাজকে ঈমান হতে বের করে নিতে পারবে। হে মুসলিম ভাই ও বোন! গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, আপনার রবের সতর্কবাণী, আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা যদি কিতাবপ্রাপ্তদের (ইয়াহুদী, খ্রিষ্টানদের) কোনো দলের অনুসরণ কর, তাহলে ঈমান আনার পর তারা তোমাদেরকে কাফিরে পরিণত করে দেবে। আর তোমরা কিভাবে কাফের হয়ে যাচ্ছ, অথচ তোমাদের সামনে পাঠ করা হয় আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং তোমাদের মাঝে রয়েছে আল্লাহর রাসূল (তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর হাদীস)। আর যারা আল্লাহকে (তাঁর দীনকে) দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে অবশ্যই তারা সঠিক পথের হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে।"[২] আল্লাহ আমাদেরকে ও আমাদের পরিবার-পরিজনদের ইসলামে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। আমীন

আশুরায়ে মুহাররাম :

মুসলিম সামজে আশুরায়ে মুহাররাম একটি সুপরিচিত বিষয়। বিশেষ করে শিয়া সম্প্রদায়ের কাছে বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন হলো আশুরায়ে মুহাররাম। তাই দেখা যায় অনেকেই এ দিনটিকে শুধুমাত্র শিয়াদের বিশেষ দিন মনে করে থাকেন। আবার কেউ শিয়াদের সংস্পর্শে থাকার কারণে তাদের ঐসব বিড়াল তাপস কর্মসূচিতেও যোগ দিয়ে থাকেন। আসলে বিষয়টি কি শুধু শিয়াদের জন্যই নির্দিষ্ট না আশুরায়ে মুহাররামে সুন্নী মুসলমানদের জন্যও কিছু রয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তর; হ্যাঁ, অবশ্যই সুন্নী মুসলমানদের জন্য আশুরায়ে মুহাররামে কিছু করণীয় রয়েছে, তবে শিয়াদের দীন-ধর্মে যা রয়েছে তা কখনই নয় বরং আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে নাবী ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম হতে যা প্রমাণিত তাই হলো সুন্নী মুসলমানদের করণীয়।

আশুরা কী? : আশুরা শব্দটির বিশ্লেষণ নিয়ে ভাষাবিদগণ মতামত প্রকাশ করেছেন। অধিকাংশের নিকট মুহাররাম মাসের দশম তারিখই হলো আশুরার দিন। ইহা আরবী শব্দ (عشر) আশারা হতে নির্গত, যার অর্থ হলো দশ। অতএব মুহাররাম মাসের দশম তারিখে সিয়াম রাখার নামই হলো আশুরার সিয়াম।[৩]

আশুরায়ে মুহাররামের সিয়াম শুধু উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য নয় বরং ইহা পূর্ববর্তী যুগেও প্রচলিত ছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার رضي الله عنهما হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট আশুরার দিবস সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি ﷺ বলেন : এদিনে জাহেলী যুগের লোকেরা সিয়াম রাখত অতএব যে রাখতে চায় রাখবে আর যে ছাড়তে চায় ছাড়বে।[৪] সহীহ মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এসেছে, আয়িশা رضي الله عنها বলেন : জাহেলী যুগে মক্কার কুরাইশ বংশের লোকেরা আশুরার সিয়াম রাখত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আশুরার সিয়াম রাখতেন।[৫]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নাবী ﷺ যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন দেখলেন যে ইয়াহুদী সম্প্রদায় দশই মুহাররামে আশুরার সিয়াম

[২] *সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১০০-১০১*

[৩] *মিরআতুল মাফাতিহ, ৭/৪৫ পৃ.*

[৪] *সহীহ মুসলিম, হা : ২৬৪২*

[৫] *সহীহ মুসলিম, হা : ২৬৩২*

রাখছে। তিনি প্রশ্ন করলেন : একী বিষয়? তারা বলল, এ হল পবিত্র দিন, যে দিনে আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন, ফলে মূসা ﷺ সে দিনটি শুকরিয়া স্বরূপ সিয়াম রেখেছেন (আমরাও তার অনুসরণ করে রাখছি)। নাবী ﷺ বললেন : আমি তোমাদের চেয়ে মূসা ﷺ এর মত সিয়াম রাখার বেশি অধিকার রাখি, অতঃপর তিনি সিয়াম রাখেন এবং অন্যদের সিয়াম রাখার নির্দেশ দেন।[৬] এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় বর্ধিত অংশে বলা হয়েছে যে, আশুরা এমন একদিন, যে দিনে নূহ ﷺ-এর কিশতি জুদী পর্বতে অবতরণ করে, ফলে তিনি শুক্‌রিয়াস্বরূপ ঐ দিনটিতে সিয়াম রাখেন। অতএব প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী নাবী ও উম্মাতের মাঝেও আশুরায়ে মুহাররামের সিয়াম রাখার ইবাদাত চালু ছিল।

আশুরায়ে মুহাররামে করণীয় : আশুরায়ে মুহাররাম সম্পর্কে আমরা পরিচিত হলাম। এখন জানা প্রয়োজন কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে আমাদের করণীয় কী? বিভিন্ন পেপার পত্রিকা ও মুসলিম বিশ্বের বাস্তব অবস্থার প্রতি নজর দিলে দেখা যায় মানুষ চার ভাগে বিভক্ত। একভাগ হলো চরমপন্থী শিয়া সম্প্রদায় যাদের কাছে এ দিনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, মূলত তাদের ঐসব কর্মকাণ্ড মুহাম্মদ ﷺ এর দীন-ধর্মে ভিত্তিহীন। দ্বিতীয় ভাগ যারা এদিন সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে গাফেল উদাসীন। তৃতীয় ভাগ যারা এদিনকে কিছুটা গুরুত্ব দেয় তবে সীমাতিক্রম করে মিলাদ মাহফিল, খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি কর্মে লিপ্ত হয়ে থাকে। চতুর্থ ভাগ যারা আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এদিনটি যথাযথ মূল্যায়ন করে থাকেন। এটাই হলো হক। ইহাই প্রতিটি উম্মাতে মুহাম্মাদীর করা উচিত। কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে অন্য মাস বা দিন-এর ন্যায় দশই মুহাররামে একই ইবাদাত, তবে বিশেষ ইবাদাত হলো সিয়াম রাখা।

আশুরার সিয়ামের ফযীলত : আশুরার সিয়াম বড় ফযীলতপূর্ণ সিয়াম, এর বদৌলতে শুধু সাওয়াবই পাওয়া যায় না বরং পূর্বের এক বছরের অপরাধ মোচন হয়ে যায়। নাবী ﷺ বলেন : আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে আশাবাদী যে, আশুরার দিবসের সিয়ামের বিনিময়ে তিনি পূর্বের এক বছরের (সগীরা) গুনাহ মোচন করে দিবেন।[৭]

আশুরার সিয়াম- এর হুকুম ও সংখ্যা : পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, ইসলামের পূর্বযুগ হতেই এ সিয়ামের প্রচলন রয়েছে, অতঃপর নাবী ﷺ-এর মাধ্যমে তা ইসলামের ইবাদাত হিসাবে গণ্য হয়। রমাযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পর ইহা সকলের মতে সুন্নাত। কিন্তু রমাযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে তার হুকুম সম্পর্কে বিদ্বানগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। কেউ ওয়াজিব বলেছেন আবার কেউ সুন্নাত বলেছেন। তবে অনেকেই ওয়াজিব বলেছেন, কারণ নাবী ﷺ নিজে সিয়াম রেখেছেন এবং সাহাবীদের সিয়াম রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আয়িশা ﷺ বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করে গেলেন তখন তিনি নিজে সিয়াম রাখলেন এবং অন্যদের সিয়াম রাখার নির্দেশ দিলেন, অতঃপর যখন রমাযানের সিয়াম ফরয হলো তখন তিনি বললেন : যার ইচ্ছা হয় আশুরার সিয়াম রাখবে, আর যার ইচ্ছা হয় না রাখবে।[৮]

নাবী ﷺ সর্বপ্রথম আশুরার সিয়াম হিসেবে মুহাররাম মাসের দশ তারিখে শুধু একটি সিয়াম রাখেন এবং সে দিনটির ফযীলাত বর্ণনা করেন। অতঃপর দশম হিজরীতে নাবী ﷺ-কে অবহিত করা হলো যে, ইয়াহুদী সম্প্রদায় এ দিনটিকে খুব মর্যাদা দেয় এবং সে দিনটিতে সিয়াম রাখে। তখন নাবী ﷺ বললেন : যদি আমি আগামী বছর বেঁচে থাকি তাহলে নবম তারিখও সিয়াম রাখব। কিন্তু আগামী বছর আসার পূর্বেই তিনি দুনিয়া হতে বিদায় নেন।[৯]

সুতরাং শুধু দশম তারিখে একটি, অথবা আগের বা পরের সাথে মিলিয়ে দু'টি, অথবা আগে ও পরেসহ মোট তিনটি সিয়াম রাখা যেতে পারে। ইহাই আশুরা উপলক্ষে শরীয়তসম্মত ইবাদাত।

আশুরায়ে মুহাররামে প্রচলিত কুসংস্কার :

আশুরায়ে মুহাররামকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজে অনেকেই অনেক রকম কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। কেউ

[৬] *সহীহ বুখারী, হা : ২০০৪, সহীহ মুসলিম, হা : ১১৩০*

[৭] *সহীহ মুসলিম, হা : ১৯৭৬*

[৮] *সহীহ মুসলিম, হা : ২৬৩২*

[৯] *সহীহ মুসলিম, হা : ২৬৬১*

এ দিনটিকে হিজরী বর্ষের প্রথম মাস হিসেবে আনন্দ উৎসব করে থাকে। মোরগ খাসী জবাই করে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সহকারে আনন্দ উল্লাসে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করে। ভাল ও নতুন পোষাক পরিধান করে এবং বিশ্বাস করে যে, বছরের প্রথম মাসে এরূপ করতে পারলে পূর্ণ বছরই তাদের আনন্দে কাটবে। এমনকি নাবী ﷺ-এর নামে বহু মিথ্যা হাদীসও তৈরী করা হয়েছে যার ইসলামে কোনো ভিত্তি নেই। তাই মুসলিম ব্যক্তির কর্তব্য হলো এসব মিথ্যা বর্জন করে সহীহ হাদীসের আলোকে আশুরায়ে মুহাররাম পালন করা।

অন্য আরেকটি দল যারা শিয়া সম্প্রদায় বলে পরিচিত এবং কিছু সুন্নী মুসলিমও তাদের সংস্পর্শে থেকে এ দিনটিকে শোকের দিন হিসাবে পালন করে থাকে। আর তারা শোক প্রকাশ করতে গিয়ে ঘোড়া, তাজিয়া, ঢাক-ঢোল মিছিল-মিটিং, বুকচাপড়ানো, মর্সিয়া গান-গজল ইত্যাদি অলীক কার্যক্রমের মাধ্যমে এ দিনটি উদযাপন করে থাকে। আবার মুসলিমদের মাঝে কেউ হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর পরিবারের জন্য সালাত সিয়াম মিলাদ মাহফিল কুরআনখানি ইত্যাদি পালন করে থাকে। এসব কিছুই ইসলামে গর্হিত কাজ যা কোনো মুসলিম ব্যক্তির জন্য শোভা পায় না বরং বর্জন করা অপরিহার্য হয়ে যায়। কারণ হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাত বরণ নিশ্চয় মুসলিমদের জন্য এক দুঃখজনক বিষয়, অবশ্য আল্লাহ তা'আলা তাকে এ শাহাদাতের মাধ্যমে আরো সম্মানিত করেছেন। কিন্তু এ শাহাদাতকে কেন্দ্র করে এভাবে শোক দিবস পালন করতে হবে তা ইসলামী নিয়ম নীতিতে পড়ে না, কারণ যদি তাই হতো তাহলে নাবী ﷺ এর চাচা আমীর হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মর্মান্তিক শাহাদাতবরণ, ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ওমার রাযিয়াল্লাহু আনহু, তৃতীয় খলীফা উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু, চতুর্থ খলীফা হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পিতা আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু সকলেরই শোক দিবস পালন করাটা আরো বেশি গুরুত্ববহ ছিল। প্রকৃতপক্ষে আশুরার ইবাদাতের সাথে হুসাইন-এর শাহাদাতের কোনো সম্পর্ক নেই। অপরপক্ষে যারা আজ শোক দিবস পালনে ব্যাকুল হয়ে পড়েছি তারা যদি সত্যিই হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি দরদী হতাম তাহলে কর্তব্য ছিল তার মতোই নাবী ﷺ-এর রেখে যাওয়া ইসলাম অনুসরণ করে চলা। কিন্তু দেখা যায়, তাদের চালচলন, আচার-আচরণ একপ্রান্তে আর ইসলাম হলো আরেক প্রান্তে। তাইতো নাবী ﷺ-এর কথাই হচ্ছে তাদের জন্য সঠিক ফায়সালা। তিনি ﷺ বলেন :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

"সে আমাদের মধ্যে নয় যে গাল চাপড়িয়ে বুক ফেড়ে জাহেলী প্রচলন অনুসরণে মর্সিয়া-ক্রন্দন করে।"[১০] অতএব মুহাম্মদ ﷺ এর অনুসারীদের কর্তব্য হবে আশুরায়ে মুহাররামকে কেন্দ্র করে ইসলাম অসমর্থিত ও গর্হিত ইবাদাতের নামে কুসংস্কার বর্জন করা এবং সহীহ হাদীসের আলোকে সুন্নাত অনুসারে আমল করা।

উপসংহার : আল্লাহ তা'আলা জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁরই ইবাদাতের জন্য। কিন্তু ইবাদাত সম্পাদনের ক্ষেত্রে মানুষের খেয়াল খুশীর ওপর ছেড়ে দেননি বরং যুগে যুগে নাবী ও রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে ইবাদাতের নিয়মনীতি শিক্ষা দিয়েছেন। আমাদের জন্য প্রেরণ করেছেন নাবী মুহাম্মদ ﷺ-কে এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে ইবাদাতের মাপকাঠী হিসাবে ঘোষণা দিয়ে বলেন :

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟﴾

"আর তোমাদেরকে রাসূল যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর এবং তিনি যা হতে বারণ করেছেন তা হতে বিরত থাক।"[১১]

অতএব উম্মাতে মুহাম্মাদীর কর্তব্য হলো আশুরায় মুহাররামে নাবী ﷺ-এর সুন্নাত অনুযায়ী ১০ তারিখ অথবা ৯ ও ১০ তারিখ সিয়াম রাখা এবং সিয়াম ব্যতীত বাকী সকল প্রকার প্রমাণহীন ইবাদত বা ইবাদাতের নামে কুসংস্কার বর্জন করে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকা। আল্লাহ আমাদের সকলকে সকল ক্ষেত্রে বিশেষ করে আশুরায় মুহাররামে নাবী ﷺ এর সুন্নাত অনুযায়ী ইবাদত করার তাওফীক দিন এবং আশুরাকে কেন্দ্র করে বিদ'আত কুসংস্কার ও জাহেলী কর্মকাণ্ড হতে হেফাযত করুন। আমীন।❑❑

[১০] *সহীহ বুখারী, হা : ১২৯৪*
[১১] *সূরা আল-হাশর, আয়াত : ৭*

দারসুল হাদীস/من أحاديث الرسول

সম্মানিত মাস মুহাররমে করণীয় ও বর্জনীয়

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা❖

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ»

আবু হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রমাযানের সিয়ামের পর সর্বোত্তম সওম হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহাররমের সওম। আর ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সলাত হচ্ছে রাতের সলাত।[১২]

ব্যাখ্যা : شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ "আল্লাহর মাস মুহাররম" এখানে মুহাররম মাসকে আল্লাহর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। আর এ সম্বন্ধপদ দ্বারা মুহাররম মাসকে সম্মানিত করা উদ্দেশ্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾

নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর কাছে গণনায় মাসের সংখ্যা বারোটি। তার মধ্যে চারটি হল সম্মানিত মাস, এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন। কাজেই এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করো না।[১৩]

আর সম্মানিত চারটি মাস হচ্ছে "মুহাররম, রজব, যিলক্বদ ও যিলহজ্জ"[১৪]

এ মাসে করণীয় : আল্লামা আলকারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ দ্বারা পুরা মুহাররম মাসের মর্যাদা বুঝানো হয়েছে। মুহাররম মাসের সিয়াম রমাযান ব্যতীত অন্যান্য মাসের সিয়ামের চাইতেও মর্যাদাবান হওয়া সত্ত্বেও নাবী ﷺ রমাযান মাস ব্যতীত অন্য কোনো মাসেই সম্পূর্ণ মাস সিয়াম পালন করেননি। এমনকি তিনি শা'বান মাসে যে রকম অধিক সিয়াম পালন করেছেন মুহাররম মাসে তেমন অধিক সিয়াম পালন করেননি। এর কারণ এমন হতে পারে যে, নাবী ﷺ-কে মুহাররম মাসের সিয়ামের এ ফাযীলাত সম্পর্কে তাঁর জীবনের শেষ দিকে অবহিত করা হয়েছিল যার কারণে তিনি আর মুহাররম মাসে অধিক সিয়াম পালনের সুযোগ পাননি। তবে তাঁর উম্মাতকে এ মাসের অধিক হারে সওম পালনের জন্য উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে এ মাসের সিয়ামের ফাযীলত বর্ণনা করেছেন।[১৫]

অতএব, এ মাসে সাধ্যানুযায়ী অধিক সিয়াম পালন করা উচিত।

আশুরার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও করণীয় :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী ﷺ হিজরত করে মদীনায় আগমন করে ইয়াহুদীদেরকে আশুরার দিনে সিয়াম পালন করতে দেখে প্রশ্ন করলেন, এটা কী? (অর্থাৎ, এটা কিসের সিয়াম) তারা বলল, এটা একটি উত্তম দিন। এ দিনে আল্লাহ তা'আলা বাণী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর কবল থেকে নাজাত দান করেন। তাই এ দিনে মূসা (আলাইহিস সালাম) সওম পালন করেন। এ কথা শুনে নাবী ﷺ বললেন : আমি তোমাদের অপেক্ষা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর অধিক নিকটবর্তী। এরপর তিনি এ দিনে সাওম পালন করেন এবং তাঁর সহচরদেরকে সওম পালনের নির্দেশ দেন।[১৬]

❖ মুহাদ্দিস, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

[১২] সহীহ মুসলিম, হা : ১১৬৩, আবূ দাউদ, হা : ২৪২৯, তিরমিযী, হা: ৪৩৮
[১৩] সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত : ৩৬
[১৪] সহীহ বুখারী, হা : ৪৬৬২
[১৫] শারহুন নাবাবী, হা : ১১৬৩ ব্যাখ্যা
[১৬] সহীহ বুখারী, হা : ২০০৪

يَوْمٌ صَالِحٌ "একটি উত্তম দিন" মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ فَصَامَهُ مُوسَى "ইহা একটি মহান দিন" "এ দিনে মূসা ﷺ সওম পালন করেন। মুসলিমের বর্ণনায় আছে, شُكْرًا لله تعالى فَنَحْنُ نَصُومُهُ মূসা ﷺ আল্লাহর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এ দিনে সওম পালন করেন এজন্যে আমরাও এ দিনে সিয়াম পালন করব।

মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় আছে :

وَهَذَا اليَوْمُ الذى اسْتَوَتْ فِيهِ السَّفِينَةُ عَلَى الْجُودِيِّ، فَصَامَ نُوحٌ شُكْرًا .

এটা এমন একটি দিন যেদিনে নূহ ﷺ-এর নৌকা জুদী পাহাড়ে স্থির হয়েছিল। ফলে নূহ ﷺ কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ঐ দিন সওম পালন করেন।[১৭]

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : জাহেলী যুগে কুরাইশগণ আশুরার দিনে সিয়াম পালন করত। রাসূল ﷺও জাহেলী যুগে এ দিনে সিয়াম পালন করতেন। অতঃপর মদীনায় আগমন করার পরও তিনি এ দিনে নিজে সিয়াম পালন করেন এবং (অন্যকেও) এ সিয়াম পালন করার নির্দেশ দেন। এরপর যখন রমাযানের সিয়াম ফরয করা হল তখন তিনি আশুরার দিনে সিয়াম পালন করা ছেড়ে দেন। অতএব, কেউ ইচ্ছা করলে সওম পালন করবে আর কেউ চাইলে তা পরিত্যাগ করবে।[১৮]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী ﷺ বলেন : সম্ভবত কুরাইশগণ তাদের পূর্ব-পুরুষ ইবরাহীম ﷺ-এর অনুসরণে এ দিনে সিয়াম পালন করতেন। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনা এ মতকে দৃঢ় করে। আর রাসূল ﷺ জাহেলী যুগে এ দিনে সিয়াম পালনের কারণ এটা হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এ দিনে সিয়াম পালন করার নির্দেশ এ জন্য দিয়েছিলেন যে, এটা একটি কল্যাণজনক কাজ অথবা এটাও হতে পারে জাহেলী যুগে কুরাইশগণ যে রকম হজ্জ সম্পাদন করতো রাসূল ﷺ তাদের সাথে সহমত পোষণ করে অনুরূপভাবে তিনি সিয়াম পালনের ক্ষেত্রেও তাদের সাথে সহমত পোষণ করেন।[১৯]

এ থেকে জানা যায় যে, আশুরার সিয়াম কোনো নতুন বিষয় নয়, বরং তা সেই নূহ ﷺ-এর যুগ থেকেই চলে এসেছে। অতএব ১০ মুহাররম তারিখে সিয়াম পালনের সাথে কারবালার ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই।

আশুরার সাওমের ফযীলত :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا اليَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ.

ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নাবী ﷺ-কে আশুরার দিনের সওমের ওপরে অন্য কোন দিনের সওমকে প্রাধান্য দিতে দেখিনি এবং এ মাস অর্থাৎ, রমাযান মাসের ওপর অন্য মাসকে গুরুত্ব প্রদান করতে দেখিনি।[২০]

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ ـ

আবূ কাতাদাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আরাফার দিবসের সওম সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, (এ সিয়ামের বিনিময়ে) আল্লাহ পূর্ববর্তী এক বছরের এবং পরবর্তী এক বছরের (সগীরাহ) গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আশুরার সওম সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী

[১৭] *ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড ২৪৭ পৃ:*
[১৮] *সহীহ বুখারী, হা : ২০০২*
[১৯] *ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড-২৪৮ পৃ.*
[২০] *সহীহ বুখারী, হা : ২০০৬*

যে, এতে তিনি পূর্ববর্তী এক বছরের (সগীরাহ) গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।[২১]

এটা বান্দার প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ যে, আরাফার সিয়ামের বিনিময়ে তিনি তার বান্দার পূর্ণ দুই বছরের সাগীরাহ গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আশুরার একদিনের সিয়ামের বিনিময়ে তিনি বান্দার পূর্ণ এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

আশুরার দিবস কোনটি?

ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : আশুরা এবং তাসূ'য়া দুটি বিশেষ্য যা দীর্ঘ স্বরে পাঠ করা হয়। অভিধানের গ্রন্থসমূহে এটি একটি প্রসিদ্ধ বিষয়। অতএব আশুরা হল মুহাররম মাসের ১০ তারিখ আর তাসূ'য়া হল মুহাররম মাসের ৯ তারিখ। জমহুর ওলামার এটাই অভিমত এবং হাদীসের প্রকাশমান অর্থও এটিই। আর ভাষাবিদদের নিকটও এটিই প্রসিদ্ধ।[২২]

আশুরা নামটি ইসলামী পরিভাষা। জাহেলী যুগের ভাষাতে এ শব্দের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় না।[২৩]

ইবনু কুদামাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : আশুরা হল মুহাররম মাসের ১০ম দিবস। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব ও হাসান বাসরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) দ্বয়ের এটাই অভিমত। কেননা ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন :

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشرمن المحرم.

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুহাররম মাসের ১০ম দিবসে আশুরার সওম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন।[২৪]

আশুরার দিবসের সাথে ৯ মুহাররমের তারিখে সিয়াম পালন করাও মুস্তাহাব।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন আশুরার সিয়াম পালন করেন এবং লোকদেরকে এ সিয়াম পালনের নির্দেশ দেন, তখন সাহাবীগণ বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! ইয়াহুদ এবং নাসারাগণ এ দিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : ইনশা আল্লাহ আগামী বছর আমরা নয় তারিখেও সিয়াম পালন করব। বর্ণনাকারী বলেন : এরপর আগামী বছর আসার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মৃত্যু ঘটে।[২৫]

ইমাম শাফিঈ, তার সহচরবৃন্দ, ইমাম ইসহাক, ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এবং অন্যান্য অনেকেই বলেন : মুহাররম মাসের নবম ও দশম এ দুদিনই সিয়াম পালন করা মুস্তাহাব। কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দশম দিনে সিয়াম পালন করেছেন। আর নবম দিনেও সিয়াম পালন করার আশা ব্যক্ত করেছিলেন। এ থেকে জানা যায় যে, ন্যূনতম পক্ষে মুহাররম মাসের দশম তারিখে সিয়াম পালন করা উচিৎ। তবে নবম ও দশম এ দুদিন সিয়াম পালন করা শ্রেয়। আর মুহাররম মাসে যত অধিক সিয়াম পালন করা যায় ততই ভাল।

৯ মুহাররমে সিয়াম পালন করা মুস্তাহাব হওয়ার হিকমত : ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : আলেমগণ মুহাররম মাসের নবম দিনে সিয়াম পালন করা মুস্তাহাব হওয়ার বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন।

১. এ দ্বারা ইয়াহুদীদের বিরোধিতা করা উদ্দেশ্য।

২. যেহেতু শুধুমাত্র একদিন নফল সিয়াম পালন করা নিষেধ করা হয়েছে যেমন জুমুআর দিন, সেহেতু নবম তারিখে সিয়াম পালন করে আশুরার সাথে একদিন যুক্ত করা উদ্দেশ্য।

৩. যাতে মুহাররম মাসের দশম তারিখের সিয়াম কোনো ভাবেই ছুটে না যায়। যেমন যিলহজ্জ মাস মূলত ২৯

[২১] *সহীহ মুসলিম, হা : ১১৬২*
[২২] *মাজমুউল ফাতাওয়া*
[২৩] *কাশশাফুল কান্না ২য় খন্ড*
[২৪] *তিরমিযী, হা : ৭৫৫*
[২৫] *সহীহ মুসলিম, হা : ১১৩৪*

দিনের হয়েছে, কিন্তু ঐ মাসের চাঁদের সঠিক হিসাব না রাখার কারণে তা ৩০ দিন গণ্য করা হয়েছে। এতে মুহাররমের নবম তারিখ আসলে দশম তারিখ। তাই নবম তারিখের সিয়াম পালন করার বিধান রাখা হয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : এসব কারণের মধ্যে প্রথমটি অধিক শক্তিশালী। আর তা হলো আহলে কিতাবদের বিরোধিতা করা। কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনেক হাদীসে তাঁর উম্মাতকে ইয়াহুদীদের বিরোধিতা করতে বলেছেন।[২৬]

"لَئِن بقيت إِلَى قَابل لأصومن التَّاسِع" এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনু হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বেঁচে থাকলে পরবর্তী বছর নয় তারিখে সিয়াম পালন করার কারণ এ হতে পারে যে, তিনি শুধুমাত্র নবম তারিখে সিয়াম পালন না করে বরং দশম তারিখের সাথে আরেকটি সিয়াম যুক্ত করতে চেয়েছিলেন যাতে ইয়াহুদীদের বিরোধিতা করা হয়। অথবা তিনি চেয়েছিলেন যাতে দশম তারিখের সিয়াম কোনোভাবেই ছুটে না যায়।

শুধুমাত্র আশুরার দিনে সিয়াম পালন করার বিধান : শাইখলু ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : আশুরার সিয়াম পালন করলে এক বছরের গোনাহ ক্ষমা হয়ে যায় এবং শুধুমাত্র আশুরার দিনে সিয়াম পালন মাকরূহ নয়।[২৭]

ইবনু হাজার হায়তামী বলেন : এককভাবে আশুরার দিনে সিয়াম পালনে কোনো সমস্যা নেই।[২৮]

শুক্রবার অথবা শনিবার আশুরার সিয়াম পালন করা : ফরয সিয়াম ব্যতীত এককভাবে শুক্রবার অথবা শনিবার সিয়াম পালন করা মাকরূহ। তবে ঐ দু'দিনের সাথে যদি আগে বা পিছে আরেক দিন মিলিয়ে সিয়াম পালন করা হয় তবে তা মাকরূহ নয়। অনুরূপভাবে কোনো অভ্যাসগত সিয়াম যদি শুধু শুক্রবার অথবা শনিবারে পালন করা হয় তবে তা মাকরূহ নয়। যেমন নিয়মিত একদিন সিয়াম পালন করা এবং একিদন ভঙ্গ করা, অথবা মানতের সিয়াম পালন, অথবা কাযা সিয়াম পালন করা অথবা এমন সিয়াম পালন করা যা শরীয়াত তার অনুমতি দিয়েছে যেমন আরাফার দিনের সিয়াম এবং আশুরার দিনের সিয়াম।[২৯]

যদি মাসের শুরু নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয় তাহলে আশুরার সিয়াম কিভাবে পালন করবে?

ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : যদি মাসের শুরু নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয় তাহলে (৮, ৯, ১০) তিন দিন সিয়াম পালন করবে যাতে নবম ও দশম দিনের সিয়াম নিশ্চিত হয়।[৩০]

অতএব, যে ব্যক্তি মুহাররম মাস শুরুর ব্যাপারে নিশ্চিত নয় অথচ সে আশুরার সিয়াম পালন করতে চায় তাহলে সে ৯ ও ১০ দুই দিন সিয়াম পালন করবে। আর যে ব্যক্তি ৯ ও ১০ দুই দিনের সিয়াম নিশ্চিত করতে চায় সে ৮, ৯ ও ১০ তিন দিন সিয়াম পালন করবে। যেহেতু আশুরার সিয়াম ওয়াজিব নয় বরং তা মুস্তাহাব তাই মুহাররম মাসের শুরুর বিষয়ে লোকদেরকে তা অন্বেষণ করার জন্য তাকিদ করা যাবে না যেরকম, রমাযান ও শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখার জন্য তাকিদ করা হয়।

আশুরার সিয়াম দ্বারা কোন প্রকারের গুনাহ ক্ষমা হয়?

ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : এ সিয়াম দ্বারা সকল প্রকার সগীরা গুনাহ মাফ হয়। অতঃপর তিনি বলেন : আরাফার দিনের সিয়ামের বিনিময়ে দুই বছরের সগীরা গুনাহ মাফ হয়। আশুরার দিনের সিয়াম দ্বারা এক বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়। যদি সালাতের ভিতরে কারো আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যায় তাহলে তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়, উল্লেখিত সকল আমলই গুনাহ মাফ হওয়ার উপযুক্ত আমল। অতএব, কারো ক্ষমাযোগ্য কোনো সগীরাহ গুনাহ থাকলে তা ক্ষমা হয়ে যাবে। তবে তার যদি কোনো সগীরাহ গুনাহ না থাকে তবে এর বিনিময়ে তার জন্য সাওয়াব লিখা হয় এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। আর তার যদি সগীরাহ গুনাহ না থাকে

[২৬] *ফাতাওয়া কুবরা, ৬ষ্ঠ খণ্ড*
[২৭] *ফাতাওয়া কুবরা, ৫ম খণ্ড*
[২৮] *তুহফাতুল মুহতাজ ৩য় খণ্ড, নফল সিয়াম অধ্যায়*
[২৯] *তুহফাতুল মুহতাজ ৩য় খণ্ড, নফল সিয়াম অধ্যায়*
[৩০] *মুগনী, ৩য় খণ্ড*

তাহলে আমরা আশা করব যে, তার কাবীরাহ গুনাহ থাকলে তা হালকা করা হবে।[৩১]

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : অযূ, সালাত, রমাযানের সিয়াম ও আরাফাত এবং আশুরার সিয়াম দ্বারা যে গুনাহ ক্ষমা করা হয় তা শুধুমাত্র সাগীরাহ গুনাহ।[৩২]

এ মাসে বর্জনীয় : ১. এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনা ইসলামী ইতিহাসে একটি মর্মান্তিক ঘটনা। যে ঘটনা সকল মুসলিমকে কাঁদায়। তবে এটাও সত্য যে, আশুরার সিয়ামের সাথে কারবালার ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই। কাজেই কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আশুরার দিনে শোক পালন করা, শোক মিছিল বের করা, হায় হোসেন! হায় হোসেন! বলে মাতম করা সবই ইসলামী নীতি বহির্ভূত কাজ। তাই সকল মুসলিমকে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকা জরুরি।

২. চারটি সম্মানিত মাসের মধ্যে প্রথম মাস হলো মুহাররম। এ মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ করা আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন। অনুরূপভাবে সকল অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾

এ সম্মানিত মাসগুলোতে তোমরা নিজেদের ওপর যুলুম করো না। অপরাধ সবসময়ই অপরাধ, তবে স্থান-কাল ভেদে অপরাধ গুরুতর হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন : অন্যায়ভাবে হত্যা করা সর্বদাই অপরাধ। কিন্তু হারামের মধ্যে হত্যাকাণ্ড ঘটানো গুরুতর অপরাধ। অনুরূপভাবে হারাম তথা সম্মানিত মাসসমূহে গুনাহের কাজ করা অধিক অপরাধ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই সম্মানিত মাসসমূহে সকল প্রকার অন্যায় অত্যাচার থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন।

﴿أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ﴾

ফরয সলাতের পরে সর্বোত্তম সলাত হলো, রাতের সলাত। যাকে আমরা তাহাজ্জুদ বা কিয়ামুল লাইল বলে থাকি। বিশেষ করে রাতের শেষ তৃতীয় প্রহরে এ সলাত আদায় করা অধিক উত্তম। কারণ এ সময়টি দু'আ কবুলের সময়। তাই যারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে চান অথবা গুনাহ ক্ষমা করাতে চান কিংবা কোনো প্রয়োজনে আল্লাহর কাছে কোনো কিছু কামনা করতে চান, তাদের জন্য শেষ রাত অত্যন্ত উপযোগী সময়। তাই প্রত্যেক মুমিনের উচিত শেষ রাতে সলাত আদায় করা। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন

হাদীসের শিক্ষা :

১. মুহাররম মাস মর্যাদাপূর্ণ মাসসমূহের একটি।

২. রমাযানের সিয়ামের পরেই এ মাসের সিয়াম অনেক ফযীলতপূর্ণ।

৩. আশুরার দিনের সিয়াম দ্বারা এক বছরের সাগীরাহ গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

৪. আশুরার সিয়াম মুস্তাহাব।

৫. আশুরার সাথে মুহাররম মাসের ৯ তারিখের সিয়াম পালনও মুস্তাহাব।

৬. শুধুমাত্র আশুরার দিনে সিয়াম পালন মুস্তাহাব যদিও তা শুক্রবার অথবা শনিবার হয়।

৭. মুহাররম মাসে অধিক হারে সিয়াম পালন করা মুস্তাহাব।

৮. নফল সালাতসমূহের মধ্যে উত্তম সালাত হলো রাতে সালাত। ❑❑

রাসূল (সা) বলেন :

যে ব্যক্তি এশার নামায জামাআত সহকারে আদায় করলো, সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত নামায পড়লো। আর যে ফজরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করলো, সে যেন পূর্ণ রাতই নামায পড়লো।

সহীহ মুসলিম, হা : ১৪৯১

[৩১] *শারহুল মুহাযযাব, ৬ষ্ঠ খণ্ড*
[৩২] *ফাতাওয়া কুবরা, ৫ম খণ্ড*

সম্পাদকীয় ১৪৪৬ হিজরী সন শুরু হতে যাচ্ছে "শাহরুল্লাহ" আল্লাহর মাস "মুহাররম" দিয়ে। স্বাগত সবার পক্ষ থেকে الافتتاحية

হজ্জ, কুরবানি, আরাফা দিবস এবং হাজারো কল্যাণের ভাণ্ডার দিয়ে মহান আল্লাহ ১৪৪৫ হিজরি সনের সবশেষ মাস জুলহিজ্জা তথা জিলহজ্জকে পাঠিয়েছিলেন। জিলহজ্জের ১ম ১০ দিন ছিল অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে আল্লাহর নিকট নফল ইবাদতের জন্য সবচেয়ে প্রিয় সময়। সুযোগ হয়েছিল রমাযানের পর সর্বাধিক নফল সিয়াম পালনের। দিনে যেমন সিয়াম পালনের, তেমনি রাতে ছিল কিয়াম করার ফজিলত। তাওবা, ইসতেগফার, তাসবীহ, তাহলীল, দান-সদাকা ও সর্বোপরি আল্লাহর ঘর যিয়ারতকারী হাজীগণ হজ্জ পালনের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত করেন ১৪৪৫ হিজরী সন। দেশে দীনদার, ঈমানদার বান্দাগণ কুরবানিকরণ এবং ঈদুল আযহা পালনের মধ্য দিয়ে নতুন হিজরী সনের প্রবেশের অপেক্ষায়। বাঙালি মুসলিমদের দৈনন্দিন দিনলিপি গণনায় হিজরী সনের চেয়ে বর্তমানে খ্রিষ্টীয় সন - যাকে আমরা ভুল করে বলি ইংরেজি সন -এর প্রভাবই বেশি। রামাযান, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা এলেই আমরা আরবী তথা হিজরী সনের দ্বারস্থ হই। অন্য সময়ে আমাদের অধিকাংশই চলমান হিজরী সনের মাস, দিন বা তারিখের খবর রাখি না। কুরআন মাজিদের 'সুরা তাওবা'র দেওয়া তথ্য মতে, মহান আল্লাহ দিন গণনার জন্য ১২ মাস দিয়ে বর্ষ সাজিয়েছেন বলে আমরা জানতে পারি। প্রশ্ন আসতে পারে, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির সূচনায় দিন গণনার ১২ মাস দিয়ে যে বছর সাজিয়েছিলেন, মানুষের কল্যাণে তা কোনটি? খ্রিষ্টীয় সন, বাংলা সন, হিন্দী সন, নেপালী সন, কোরিয়ান সন, চীনা সন, জাপানী সন নাকি আরবী তথা হিজরী সন? পৃথিবীতে বহু সন প্রচলিত আছে। প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব সংস্কৃতির অংশ হিসেবে তাদেরও স্বতন্ত্র বছর রয়েছে। তবে মহান আল্লাহ চন্দ্র উদয় ও অস্ত যাওয়ার সময়কে দিন গণনার ১২ চাঁদের উদয়ের সাথে যে বছরের মাসের সূচনা হয় এটিকেই আদিবর্ষ রূপে নিরুপণ করে দিয়েছেন। এর প্রমাণ কুরআন মাজিদেই উল্লেখ রয়েছে। মহান আল্লাহ 'সূরা তাওবা'র ৩৬ নং আয়াতে বলেন, "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট নিশ্চয়ই মাসসমূহের সংখ্যা হলো বারো মাস। এর মধ্যে চারটি মাস হলো হারাম (মর্যাদাপূর্ণ)। এটাই সরল বিধান। অতএব তোমরা এসব মাসে নিজেদের প্রতি যুলুম করো না। আর অংশীবাদীদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ সাবধানীদের সাথে রয়েছেন।" এতে স্পষ্ট যে, ৪টি আরবী হারাম মাস তথা মর্যাদাপূর্ণ মাস রসূলুল্লাহ ﷺ নিজের ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। ৩টি একত্রিত ও ১টি স্বতন্ত্র। আর তা হলো জিলকদ, জিলহজ্জ ও মুহররম এবং ১টি আলাদা 'রজব' মাস। অতএব এ মাসগুলো রয়েছে আরবী তথা হিজরী সনে। এটি মহান আল্লাহর দেওয়া সর্বপ্রথম দিন গণনার বছর, মাস। মুসলিমদের জন্য প্রধান দিন গণনার মাস হিজরী মাস হওয়া একান্ত কাম্য। কিন্তু আমরা তা পরিহার করে খ্রিষ্টীয় সন গণনাকে প্রাধান্য দিয়েছি আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে। অথচ প্রাত্যহিক জীবনে হিজরী সনের রয়েছে দীনি গুরুত্ব। প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ সিয়াম পালন করা হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত। মুহাররমের ১০ তারিখের ১ দিনের রোযা পালন ১ বছরের গুনাহ মাফের সুযোগ, জিলহজ্জের প্রথম ১০ দিনের ইবাদত আল্লাহর নিকট অতি পছন্দের। ইয়াওমে আরাফার ১টি রোযা ২ বছরের (আগে-পেছনের) গুনাহ মাফের সুযোগ। তবে ঈদে মিলাদুন্নবীর ১২ই রবিউল আওয়াল, শাবান মাসের ১৫ তারিখের রোযা, শবে মিরাজের ২৭ রজবের সিয়াম হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত না হওয়ায় তা বিদ'আত হিসেবে গণ্য। আমাদের সুন্নাতের অনুসরণ ও বিদ'আত পরিহার করা আবশ্যক। আমরা সাধ্যমতো ১০ মুহাররমের আশুরার রোযাটি রাখতে সচেষ্ট হবো এবং কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনায় মাতম নয়, মর্সিয়া নয়, রাসূল ﷺ-এর নাতি ও আলী رضي الله عنه-এর তনয় হুসাইন رضي الله عنه-এর শাহাদাতকেন্দ্রিক শিয়াদের মর্সিয়া ও মাতমের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই আমরা মাতম থেকে বিরত থাকব। হুসাইন رضي الله عنه-এর শাহাদাতের সাথে আশুরারও কোনো সম্পর্ক নেই। শোক প্রকাশের জন্য কালো কাপড় পরা, মাতম করা ও রক্ত ঝরানো জায়েজ নয়।

এবারের হজ্জে প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ ও উত্তপ্ত গরমে হিট স্ট্রোকে বহু হাজীর মৃত্যুতে আমরা সমবেদনা প্রকাশ ও তাদের জন্য দু'আ করছি। আল্লাহ তাঁদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ মাকামে স্থান প্রদান করুন এবং তাঁদের পরিবারকে ধৈর্য ধারণের তাওফিক দিন। এবার সৌদি সরকারের রয়েল গেস্ট হিসেবে জমঈয়তের ৪ জন শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে হজ্জ পালনের সুযোগ দেওয়ায় আমরা মহামান্য বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজ, ক্রাউন প্রিন্স মুহাম্মদ বিন সালমান ও ধর্ম মন্ত্রণালয়, সৌদি আরবের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তাদেরকে দিয়ে মুসলিম মিল্লাতের জন্য সর্বদা কল্যাণকর কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন। ❑❑

দাওয়াত ও তাবলীগী ইজতেমা ২০২৪, বাইপাইল-এ শাইখ মাহির বিন যাফের আল-কাহতানীর জুম'আর খুতবার বঙ্গানুবাদ

অনুবাদ ও সম্পাদনা : শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী★ ও শাইখ আব্দুল হাসিব

পর্ব- ১

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, তার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করছি, ক্ষমা প্রার্থনা করছি আমাদের মন্দ কাজকর্ম ও অন্তরের অনিষ্ঠা থেকে তার কাছেই পানাহ চাই, আল্লাহ যাকে সুপথ দান করেন তার পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই, যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার সুপথদানকারী কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সত্য কোনো মাবূদ নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَ لَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ﴾

'হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তোমরা পরিপূর্ণ মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে কোনো অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করো না'।[৩৩]

﴿يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا﴾

'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন; আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে নিজ নিজ হক দাবি কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারেও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক'।[৩৪]

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا﴾

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সঠিক কথা বল। তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে'।[৩৫]

অতঃপর, নিশ্চয় সর্বোত্তম বাণী আল্লাহর কিতাব, সর্বোত্তম পথ মুহাম্মদ ﷺ এর পথ। আর মন্দ বিষয় হলো নবআবিষ্কারসমূহ, প্রত্যেক নব-আবিষ্কার হলো বিদ'আত, প্রত্যেক বিদ'আত ভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতাই জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

হে মানবমন্ডলি! আল্লাহকে ভয় করো! জেনে রাখ, আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রত্যেক দেশের মানুষই তার দেশে নিরাপত্তা চায়। কিন্তু তারা কখনো শান্তি ও নিরাপত্তা পায়, আবার কখনো পায় না। জেনে রাখা আবশ্যক যে, শান্তি ও নিরাপত্তা আল্লাহরই হাতে। চাই সেটা মানুষের জানের সাথে সম্পৃক্ত হোক, যেমন রক্তপাত থেকে ও জুলুম-অত্যাচার থেকে রক্ষা করা কিংবা চাই সেটা মানুষের সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত হোক, যেমন দেশকে দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করা কিংবা মহামারি ও বিভিন্ন রোগ থেকে হেফাযত করা। সবই দয়ালু দয়াময় আল্লাহর হাতে। বান্দা যখন জানতে পারবে যে, শান্তি ও নিরাপত্তা কেবল আল্লাহরই

★ ফাতাওয়া ও গবেষণা বিষয়ক সেক্রেটারী-কেন্দ্রীয় জমঈয়ত। ও মুহাদ্দিছ মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া।

[৩৩] সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১০২

[৩৪] সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১

[৩৫] সূরা আহযাব, আয়াত : ৭১-৭২

নিয়ন্ত্রণে, অতঃপর তা অর্জনের জন্য শরীয়তসম্মত পন্থা অবলম্বন করবে, তখন সে তা অর্জন করতে পারবে, ইন শা আল্লাহ। আর যদি সে প্রচেষ্টা না করে তাহলে সে তা অর্জন করতে পারবে না। আর যদি চেষ্টা ছাড়াই তা অর্জন করে তাহলে সেটা হবে পরবর্তীতে শাস্তি দেয়ার জন্য অবকাশস্বরূপ। যেটা শান্তি ও নিরাপত্তা না পাওয়া থেকে অধিক ক্ষতিকর। আল্লাহর কাছে তা থেকে রক্ষা চাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ أُمْلِيْ لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ﴾

'আমি তাদেরকে ক্রমে ক্রমে ধরব এমনভাবে যে, তারা জানতে পারবে না। আর আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি, নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ'।[৩৬]

যে ব্যক্তি জানবে ও দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে, শান্তি ও নিরাপত্তা একমাত্র দয়াময়, দয়ালু পরম করুণাময় আল্লাহর হাতে, সে তখন আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে সেটা চাইবে না। তা অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম সে শরীয়তের উপায়-উপকরণসমূহ বাস্তবায়ন করবে। তাইতো কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۫ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ تُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۫ وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۫ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

'বলো হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন; যাকে ইচ্ছা আপনি সম্মানিত করেন আর যাকে ইচ্ছা আপনিত করেন। কল্যাণ আপনারই হাতে। নিশ্চয়ই আপনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আপনি রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে প্রবিষ্ট করেন; আপনি মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন, আবার জীবন্ত থেকে মৃতকে বের করেন। আর আপনি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযক দান করেন'।[৩৭]

সুতরাং নিরাপত্তা যেহেতু একমাত্র আল্লাহর হাতেই, তাই তার পথ অবলম্বন ছাড়া আমরা তা অর্জন করতে পারব না, তার পথ অবলম্বনের পদ্ধতি তিনি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। আর কে আছে আল্লাহর চেয়ে কথায় অধিক সত্যবাদী? দেশে দেশে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ তা'আলা উপায় বর্ণনা করে দিয়েছেন তা হলো, দয়াময় আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলার তাওহীদ বাস্তবায়ন করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ﴾

'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত'।[৩৮]

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ 'আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু হতে বর্ণনা করেন যে,

لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالُوا أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ (يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)

'যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল, যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানের সাথে যুলুম মিশ্রিত করেনি, তখন তা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সহাবীদের জন্য কঠিন মনে হল। তারা বলল, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে তার নফসের উপর যুলুম করে না? তখন রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

[৩৬] *সূরা আল-কালাম, আয়াত : ৪৪-৪৫*

[৩৭] *সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ২৬-২৭*

[৩৮] *সূরা আন'আম, আয়াত : ৮২*

বললেন, তোমরা যা ধারণা করছ তা নয়। বরং এটা হচ্ছে ঐরূপ যেমন লোকমান আলাইহিস সালাম তার পুত্রকে বলেছিল- 'হে বৎস! আল্লাহর সঙ্গে কোনো শরীক করো না। শির্ক তো বড় যুলুম'।[৩৯]

সুতরাং স্পষ্ট যে, তাওহীদ বাস্তবায়ন ছাড়া নিরাপত্তা সম্ভব নয়, তাওহীদ হলো : একমাত্র আল্লাহর জনই ইবাদত করা, তা হলো لا إله إلا الله এর অর্থ বাস্তবায়ন করা। যার অর্থ হলো, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত সত্য কোনো মা'বুদ নাই। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য জবেহ করবে না, আল্লাহ ছাড়া কাওকে ডাকবেনা, আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য মানত করবে না কোনো কবর, পাথর, গুহা, মূর্তির চার পাশে তাওয়াফ করবে না, আর আল্লাহ সুবহানাহু তাআ'লার শরীয়তে বর্ণিত পদ্ধতিতে কাবা ঘর ছাড়া কোনো কিছুকে তাওয়াক করার অনুমতি দেননি। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ لَا شَرِیْکَ لَہٗ ۚ وَبِذٰلِکَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ﴾

'বলে দাও, নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার ইবাদত ও আমার জীবন-মরণ সবই আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমাকে এরই হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং আনুগত্য স্বীকারকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম'।[৪০]

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَاعْبُدُوا اللّٰہَ وَلَا تُشْرِکُوْا بِہٖ شَیْئًا﴾

'এবং আল্লাহর ইবাদত কর ও তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করো না'।[৪১]

﴿وَقَضٰی رَبُّکَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِیَّاہُ وَبِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا﴾

'তামার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো,[৪২] হে আল্লাহর বান্দারা! যে ব্যক্তি তাওহীদের দ্বারা শুধুমাত্র আল্লাহর রুবূবিয়্যাতকে সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য করবে, সে আহলুল কালাম ও আশআরীদের মতোই; বরং তাওহীদ দ্বারা **توحيد العبادة** উদ্দেশ্য। যেমনটি মুজাদ্দিদ ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তিনি বলেন, নিশ্চয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সুস্পষ্টভাষী আরবদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদেরকে বললেন তোমরা لا إله إلا الله বলো, তখন এর মাধ্যমে তারা বুঝেছিল যে, তিনি তাদেরকে মূর্তিকে অস্বীকার করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করছেন। তিনি লাতের দিকে আহ্বান করেননি। লাত ছিল একজন সৎব্যক্তি, যে হাজীদেরকে খাওয়াতো। তিনি উয্যা ও মানাত এর দিকেও আহ্বান করেননি। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থ হচ্ছে কেউ ঈসাকে ডাকবে না, উযাইরকেও না আব্দুল কাদের জিলানিকেও না, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের কাউকে ডাকবে না। অনুরূপ কোনো সৎ লোককেও ডাকবে না। কোনো সৎলোকের ওয়াসিলায়ও আল্লাহর কাছে দু'আ করবে না। *(চলবে ইনশা আল্লাহ)*

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন :

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.....

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে অযু করে। অতঃপর জুমআয় এসে নিশ্চুপে মনোযোগ সহকারে খুৎবা শোনে তার এক জুমআ থেকে আর এক জুমআর মধ্যবর্তী দিনগুলো সহ অধিক আরো তিন দিনের গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। সহীহ মুসলিম হা : ১৯৮৭

[৩৯] *সূরা লোকমান, আয়াত : ১৩*
[৪০] *সূরা আল-আন'আম, আয়াত : ১৬২-১৬৩*
[৪১] *সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৩৬*
[৪২] *সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ২৩*

যুক্তিবাদের অজ্ঞতা সংশয় ও সমাধান

শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব *

(পর্ব-০১)

সংশয়বাদ তথা নাস্তিক্যবাদের কবল থেকে জাতিকে দ্বীনের প্রতি আহ্বান করতে তাদের উত্থাপিত সংশয়ের উপযুক্ত জবাব দেওয়া জরুরি। বর্তমান সময়ে নাস্তিকতার দিকে যুবসমাজের ঝুঁকে পড়ার প্রধান কারণ হলো ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতা। যে অজ্ঞতার কারণে পশ্চিমা প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে সংশয়বাদী হয়ে ওঠে। কেউ মূলত শুধু অজ্ঞতার কারণে সংশয়বাদী হয়ে ওঠে আবার কারো ক্ষেত্রে এর সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বার্থও যুক্ত হয়ে যায়। এমন অনেক নাস্তিক রয়েছে যার আয়ের প্রধান উৎসই নাস্তিকতা। আল্লাহ এবং তার রাসূল ﷺ এমনকি শরীয়তের কোনো বিষয়ে নেতিবাচক ও কু-কথা ছড়িয়ে দিতে পারলেই মোটা অংকের লেনদেনের পাশাপাশি কাঙ্খিত নাগরিকত্বও পেয়ে যেতে পারে। এছাড়াও সময়ে নাস্তিক অসময়ে আস্তিক কিংবা সময়ে আস্তিক অসময়ে নাস্তিক নামক বর্ণচোরাদের সংখ্যা একেবারেই কম নয়।

সুতরাং নাস্তিক্যবাদের সকলেই এক ক্যাটাগরিতে আবদ্ধ নয় বরং তাদের মাঝেও ভিন্নতা রয়েছে।

তবে নাস্তিক্যবাদের শ্রেণীগত ভিন্নতা থাকলে ও সমস্ত নাস্তিক্যবাদের মূলমন্ত্র একটাই- তা হলো ধর্ম, বিশেষ করে ইসলাম সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করা ও তা প্রচার করা। সে জন্যই ইসলামের ওপর আরোপিত নাস্তিক্যবাদের বিভিন্ন অভিযোগ ও সংশয়ের দলীলভিত্তিক জবাব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। জবাবগুলো সকল নাস্তিকরা সানন্দে গ্রহণ করবে ও সঠিক পথে ফিরে আসবে এমনটা হওয়ার কারণ ও সম্ভবনা কোনোটাই নেই। তবে তাদের সংশয়গুলোর দালীলিক উত্তর প্রদান নিজ কর্তব্যের জায়গা হতেই প্রয়োজন অনুভব করছি। আল্লাহ তা'আলাই উত্তম তাওফীকদাতা।

সংশয়-১, স্রষ্টা কে? স্রষ্টা বা আল্লাহ বলতে কিছু আছে কি ? "নাউযু বিল্লাহ"

প্রখ্যাত ব্রিটিশ গাণিতিক ও দার্শনিক এবং বিখ্যাত নাস্তিক বার্ট্রান্ত রাসেল (১৮৭২-১৯৭০) স্রষ্টার পরিচয় খুঁজে না পেয়ে বলে ফেললেন : স্রষ্টা বলতে কিছুই নেই!! স্রষ্টা একটি অলৌকিক ধারণা, বাস্তবে স্রষ্টা বলতে কিছুই নেই। খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে প্রাচীন সভ্যতার উজ্জল ব্যক্তিত্ব থেলাস, এক্সিমান্ডার ও এক্সিমেনিস এ ধারণা প্রচার করতেন।

বর্তমান সময়ের নাস্তিকদের এটা একটি কমন প্রশ্ন যে, স্রষ্টা বা আল্লাহ কে? আদৌ কোনো স্রষ্টা আছে কি?

উত্তর : স্রষ্টা কে? এমন প্রশ্ন বা সংশয় যে কেউ চাইলেই করতে পারে তাতে স্রষ্টার কিছু যায় আসে না, স্রষ্টা তাঁর নিজ অস্তিত্বে বলিয়ান ও অটুট রয়েছেন।

মুসলিম হিসাবে স্রষ্টা বা আল্লাহর অস্তিত্বে, প্রতিপালনে, উলুহিয়্যাহতে ও গুণাবলীতে সংশয়মুক্ত বিশ্বাস ও স্বীকৃতি প্রদান করা আবশ্যক, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সংশয়বাদীদের স্রষ্ট সংক্রান্ত যে প্রশ্ন, স্রষ্টা কে? স্রষ্টা বলতে আদৌ কিছু আছে কি? এমন প্রশ্নের উত্তর সহজভাবে পেতে নিজেকে একটা প্রশ্ন করা উচিৎ, তা হলো : আমি কার? আমি কি সত্যিই আমার? ভেবে দেখুন তো আমি কি সত্যিই আমার? আমি পিতার ঔরসে আসলাম, এতে আমার কোনো পরিকল্পনা কিংবা ইচ্ছা কোনোটাই নেই। এরপর শুক্রানুরূপে মায়ের জরায়ুতে প্রবেশ করলাম, তাতেও আমার কোনো হাত নেই। এরপর শুক্রানু থেকে রক্তপিণ্ড, সেখান থেকে মাংসপিণ্ড, এরপর হাড় মাংসের সংযুক্তি ও চামড়ার প্রলেপ এবং আত্মার সংযোজন কোনো কিছুতেই আমার কোনো কর্তৃত্ব কিংবা ইচ্ছা কোনোকিছুর প্রতিফলন ঘটেনি। এরপর আমি জরায়ুর সময়কাল পূর্ণ করে নবজাতকরূপে দুনিয়ায় ভূমিষ্ট হলাম এতেও আমার

* মুদাররিস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা ও পাঠাগার সম্পাদক- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা মহানগর।

কোনো হাত নেই !! এরপর শিশু থেকে কিশোর, কিশোর থেকে যুবক, যুবক থেকে বৃদ্ধ এতেও আমার কোনো হাত নেই।

আমার প্রবল অনিচ্ছা থাকার পরও মাথার চুলগুলো সাদা হয়ে যাচ্ছে, কালো করার কোনো ক্ষমতা নেই। শরীরের টগবগে চামড়ায় ভাঁজ পড়ে যাচ্ছে ফেরানোর কোনো ক্ষমতা নেই। আমার দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে গেলো ফেরানোর কোনো ক্ষমতা আমার কাছে নেই। যৌবনের তেজস্ক্রিয়তা নিভে গেলো আমার কোনো কিছু করার নেই। সারা জীবন যত খাদ্য গ্রহণ করলাম তার একটি কনাও আমার তৈরি নয়। হঠাৎ মৃত্যু এসে হাজির, পালানোর কোনো ক্ষমতাও আমার নেই। এরপরও কি বলবো আমি আমার। কখনই নয়, উত্তর একটাই আসতে পারে, তা হলো আমি আমার নয়, আমার নিয়ন্ত্রণ আমার হাতে নেই, আমার আমি অন্য কোনো অদৃশ্য শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই আমার আমিসহ বিশ্বের সবকিছু অদৃশ্য থেকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি তো স্রষ্টা তিনি আল্লাহ তা'আলা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

তিনি আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ একমাত্র তাঁরই। আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সব কিছুই তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।[৪৩]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর পরিচয় দিয়ে বলেন :

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ () اللَّهُ الصَّمَدُ () لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ () وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

বল, তিনি আল্লাহ যিনি এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি জন্মগ্রহণ করেননি এবং কাউকে জন্মও দেননি এবং তার সমকক্ষ কেউ নেই।[৪৪]

[৪৩] *সূরা হাশর, আয়াত : ২৪*
[৪৪] *সূরা ইখলাস, আয়াত : ১-৪*

আলোচ্য সূরাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পরিচয় তুলে ধরেছেন এবং বাতিল স্রষ্টাকে বাতিল করার মাপকাঠি ও প্রদান করেছেন। যেমন **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** বল আল্লাহ তা'আলা এক অদ্বিতীয়। সুতরাং যিনি একক নন, যার পূর্বাপর কেউ আছেন তিনি কোনোক্রমেই স্রষ্টা কিংবা আল্লাহ নন।

اللَّهُ الصَّمَدُ আল্লাহ অমুখাপেক্ষী।

সুতরাং যিনি অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষী হন, কাজে কর্মে পরমুখাপেক্ষিতা ছাড়া চলতে পারে না তিনি স্রষ্টা হওয়ার যোগ্য নন।

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ তিনি জন্ম দেননি এবং জন্মগ্রহণও করেননি। এটা আল্লাহ তা'আলার তৃতীয় পরিচয়। তিনি জন্ম দেওয়া ও নেওয়া থেকে চিরমুক্ত ও অমুখাপেক্ষী।

সুতরাং মায়ের গর্ভে জন্মলাভ করা এবং অন্যকে জন্ম দেয় এমন কেউ স্রষ্টা হওয়ার যোগ্য নয়।

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ তার সমকক্ষ কেউ নেই।

এটা আল্লাহ তা'আলার চতুর্থ পরিচয়।

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার সদৃশ, তাঁর সমান, সমতুল্য, সমমর্যাদার ও সমগুণাবলীর কেউ নেই।

সুতরাং এখানে আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ পরিচয় ফুটে উঠেছে। স্রষ্টার প্রতি কেউ অনাস্থা জারি করলে কিংবা স্রষ্টায় অবিশ্বাস করলে তাকে অবশ্যই উল্লেখিত গুণাবলী সম্পন্ন কিংবা তার থেকে ভালো ও অধিক গুণাবলীসম্পন্ন ভিন্ন কোনো স্রষ্টার সন্ধান দিতে হবে।

সকল নাস্তিকদের কাছে প্রশ্ন রেখে যদি বলা হয়, কুরআন মাজীদে উল্লেখিত সূরা ইখলাসে বর্ণিত পরিচয়সংবলিত আল্লাহ ব্যতীত ভিন্ন কোনো স্রষ্টার অস্তিত্বের সন্ধান কি তাদের কাছে আছে? যদি থাকে পেশ করো। না থাকলে স্রষ্টা হিসাবে আল্লাহতে বিশ্বাস করতে আপত্তি কেন??

সংশয়-২, আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন? নাস্তিকদের উত্থাপিত আরো একটি বড় সংশয় হলো আল্লাহই যদি সব কিছুর স্রষ্টা হয়ে থাকেন তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন? "আউযু বিল্লাহ"

উত্তর : আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন? এ প্রশ্নের উত্তর করার আগে নিজের প্রতি একটি প্রশ্ন করা জরুরি। তা হলো স্রষ্টা সম্পর্কে প্রশ্ন করার মতো মেধা আমার আছে কি? আমার মেধায় যদি এরকম প্রশ্ন করার সক্ষমতা না থাকে তাহলে স্রষ্টা বা আল্লাহ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা শুধু অজ্ঞতাই নয় বরং সামর্থ্যের বহুগুণ বাহিরে থাকা বিষয় নিজের ওপর চাপিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে নিজের বিশ্বাসের অস্তিত্বকে হত্যা করার মতো আত্মঘাতী কাজও বটে। আর সব থেকে বড় সত্য তো এটাই যে, স্রষ্টা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করার সক্ষমতা কোনো সৃষ্ট জীবের নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾

তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বল রূহ হলো আমার রবের নির্দেশ। আর তোমাদেরকে সামান্যতম জ্ঞান দান করা হয়েছে।[৪৫]

আলোচ্য আয়াতে কারীমাটি প্রমাণ করে যে, মানুষের তার নিজ আত্মা সম্পর্কে জানার মতো জ্ঞান নেই।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এতো স্বল্প জ্ঞান মানুষকে দিয়েছেন যা দ্বারা তারা নিজ আত্মা সম্পর্কে সঠিক কোনো ধারণা লাভ করতে পারবে না, সেখানে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন? এমন প্রশ্ন উথ্যাপন করা আরো অনেক দূরের ব্যাপার।

নাবী ﷺ বলেছেন,

وَوَقَعَ عُصْفُورٌ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ ، فَغَمَسَ مِنْقَارَهُ الْبَحْرَ فَقَالَ الْخَضِرُ لِمُوسَى مَا عِلْمُكَ وَعِلْمِي وَعِلْمُ الْخَلاَئِقِ فِي عِلْمِ اللَّهِ إِلاَّ مِقْدَارُ مَا غَمَسَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنْقَارَهُ.

মূসা এবং খাজির عليهما السلام যখন নৌকায় চড়ে নদী পার হচ্ছিলেন তখন একটি চড়ুই পাখি নৌকার কিনারায় বসে পড়লো, অতঃপর সাগরে তার ঠোঁট ডুবিয়ে দিয়ে পানি আহরণ করলো। অতঃপর খাজির عليه السلام মূসা عليه السلام কে বললেন : আমার ও তোমার জ্ঞান এবং সমস্ত সৃষ্টিকুলের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের তুলনায় চড়ুই পাখির ঠোঁটে ওঠা (সামান্য পরিমাণ) পানির সমতুল্যও নয়[৪৬]

সুতরাং অতি সামান্য জ্ঞান ও মেধা নিয়ে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা ও তাঁর স্রষ্টার অনুসন্ধান করা শুধু অজ্ঞতাই নয় বরং একটি সূঁচের পেছন ছিদ্র দিয়ে পৃথিবী প্রবেশ করানোর মতো আহাম্মকি চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বার্ট্রান্ড রাসেল যখন প্রশ্ন উত্থাপন করে বলে যে, আল্লাহর সৃষ্টিকর্তা কে? বা স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করেছেন? প্রতিউত্তরে আইনস্টাইল (১৮৭৯-১৯৫৫ খ্রি :) বলেছিলেন : তোমার মস্তিস্কের ব্যাস কি ন্যূনতম ২০,০০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ? যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে এ প্রশ্নটি করার তোমার কোনো অধিকার নেই।[৪৭]

আমরা জানি আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার অর্থাৎ ১ সেকেন্ডে আলো ৩ লক্ষ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেয় আর এক বছরে আলো যতদূর পথ পারি দেয় তাকে ১ আলোকবর্ষ বলে, তারই ২০,০০০ বিশ হাজার বিলিয়ন আলোক বর্ষের সমান ব্যাসসম্পন্ন মস্তিস্কের প্রয়োজন স্রষ্টা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করার জন্য।

সুতরাং স্রষ্টা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করাটা অজ্ঞতাপূর্ণ বিষয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছেন : اللَّهُ الصَّمَدُ আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, এর অর্থ হলো তিনি কোনো কিছুর প্রতি মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং তিনি সৃষ্টি হওয়া থেকে অমুখাপেক্ষী বিধায় তার কোনো স্রষ্টা নেই। তিনি সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনিই শেষ ও চূড়ান্ত স্রষ্টা তারপর কোনো স্রষ্টা নেই।

১০ থেকে উল্টো দিকে গণনা করলে ০১- এ এসে সংখ্যা শেষ হয়ে যায় একের পর আর কোনো সংখ্যা

[৪৫] *সূরা ইসরা, আয়াত : ৮৫*

[৪৬] *সহীহ বুখারী, হা : ৪২১৩*

[৪৭] *আল কুরআন দ্য চ্যালেঞ্জ মহাকাশ পর্ব ৩৩৬ পৃ.*

নেই। কেউ যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলে ০১- এর পর কোন সংখ্যা? ০১- এর পর কোনো সংখ্যা থাকলো না কেন? এ প্রশ্নটা যেমন হাস্যকর ও অনর্থক ঠিক তেমনই আল্লাহর স্রষ্টাকে, তারপর কোনো স্রষ্টা থাকলো কেন? এ প্রশ্নটাও হাস্যকর ও অনর্থক।

বাবার বড় ছেলে বাবাকে যদি বলে আমি সবার বড় ভাই, তো আমার বড় ভাই কে? আমার বড় ভাই থাকলো না কেন? কেউ যদি বাসার ছাদের শেষ সীমানায় যেয়ে বলে এটাই সীমানা কেন?

কোনো কৃষক যদি নিজ জমিতে যেয়ে বলে, এখানেই আমার জমি শেষ কেন? সীমানার ওপারে আরো থাকলো না কেন? স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছে ১৯৭১ সালে। কেউ যদি বলে, ১৯৭১ সাল ১টা কেন? এর পর আরো একটা ১৯৭১ সাল থাকলো না কেন? ২০২৪ সাল একটাই কেন? আরো ২০২৪ সাল থাকলো না কেন?

এ সকল প্রশ্নই অহেতুক ও হাস্যকর এবং এসব প্রশ্ন পাগল ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ হতে উত্থাপিত হওয়ার কথা নয়। অনুরূপভাবে আল্লাহই একমাত্র স্রষ্টা কেন? আল্লাহর স্রষ্টা নেই কেন? থাকবে না কেন? এসব প্রশ্ন করাও হাস্যকর। এসব প্রশ্ন করার অর্থ হলো বাংলা ভাষায় উল্লেখিত শেষ বা সর্বশেষ শব্দটার ইজ্জত নষ্ট করা। সুতরাং আল্লাহই সর্বশেষ ও চূড়ান্ত স্রষ্টা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

তিনিই প্রথম ও তিনিই শেষ, তিনিই প্রকাশ্য ও গোপন এবং তিনিই সবকিছু সম্পর্কে অবগত।[৪৮]

তিনিই প্রথম-এর অর্থ হলো যখন সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে কিছুই থাকবে না তখনও একমাত্র তিনিই থাকবেন।

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ () وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবকিছুই নশ্বর। অবিনশ্বর শুধু আপনার রবের চেহারা যিনি মহিমাময় মহানুভব।

চলবে ইনশা আল্লাহ

বিষাক্ত ও কষ্টদায়ক প্রাণীর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার দুআ

বর্তমানে রাসেল ভাইপার সাপের আতঙ্কে আতঙ্কিত পুরো দেশবাসী। তাই সকাল, সন্ধ্যা তিনবার এই দুআটি পড়তে পারেন। ইনশাআল্লাহ আল্লাহর ইচ্ছায় সাপসহ অন্যান্য বিষাক্ত প্রাণী থেকে হেফাজতে থাকবেন।

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এই দু'আ তিনবার পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সমস্ত প্রাণী, বিশেষ করে সাপ, বিচ্ছু প্রভৃতি বিষাক্ত ও কষ্টদায়ক প্রাণীর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন।

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

উচ্চারণ : আউজু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খলাক।

অর্থ : আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমার দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থণা করছি।

তিরমিজি, হা : ৩৬০৪

সাপ কামড় দিলে যা করতে হবে :

অতি দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে।

ওঝা, সাপুড়ে কবিরাজকে দেখিয়ে সময় নষ্ট করবেন না।

বাংলাদেশে সব ধরনের সাপে কাটা রোগীর বেশির ভাগ মারা যান দেরিতে হাসপাতালে আসায় ও আতংকিত হয়ে হার্ট এট্যাকে।

[৪৮] *সূরা হাদীদ, আয়াত : ৩*

পুরুষদের জন্য কাতারের পেছনে একাকী সলাত হবে না

ইবনু আকবার❖

(২য় পর্ব)

কাতারের পেছনে একা সলাত আদায় বাতিল : ৫ম দলীল :

আবূ হুরায়রাহ ﵁-এর আদেশ, কাতারেই দাঁড়াতে হবে :

(حدثنا أبو جعفر محمد بن بكر الرازي قال : ثنا خالد بن يوسف بن خالد السمتي ، قال : ثنا عبد الله بن رجاء المكي ، عن ابن عجلان ، عن الأعرج) عن أبي هريرة ، قال : « لا تركع حتى تأخذ مكانك من الصف »

আবূ হুরায়রাহ ﵁ বলেন, তুমি রুকূ' করবে না যতক্ষণ না কাতারে দাঁড়ানোর জায়গা পাও।[৪৯]

আসারটি প্রমাণ করছে, কাতারের বাইরে দাঁড়ানো মুসল্লির জন্য জায়েয নয়। তাই কাতারের বাইরে একাকী সলাত আদায় বৈধ হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

আবূ হুরায়রাহ ﵁ এর কাতারে দাঁড়ানোর নির্দেশ প্রমাণ করে ওয়াবিছহ এবং 'আলী বিন শাইবা-ন বর্ণিত হাদীসের হুকুম সঠিক। কাতারের পেছনে একাকী সলাত বাতিল। আর আবূ বাকরাহ ﵁ এর হাদীস দিয়ে কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়ানোর মতকেও প্রত্যাখ্যান করে।

তাবিয়ী ইব্রাহীম নাখঈ এবং আতা বিন আবী রবাহ থেকে বিশুদ্ধ মত :

(حدثنا حفص عن عمرو بن مروان) عن إبراهيم قال يعيد .

তাবিয়ী ইব্রাহীম নাখয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, কাতারের পেছনে একাকী সলাত আদায়কারী পুনরায় সলাত আদায় করে নেবে।[৫০]

(حدثنا عباد بن العوام عن عبد الملك) عن عطاء قال لا يقم وحده .

তাবিয়ী আতা বিন আবী রবাহ বলেন, কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়াবে না।[৫১]

(عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر) عن إبراهيم في الرجل يجد الصف مستويا قال يؤخر رجلا فإن لم يفعل لم تجز صلاته.

তাবিয়ী ইব্রাহীম নাখয়ী ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে বলেন, যিনি এসে কাতার পূর্ণ পাবে, তিনি যেন একজন লোককে পেছনে টেনে নেন। যদি এমনটা না করেন তাহলে তার সলাত জায়েয নয়।[৫২] আসারটির সানাদে উসমান বিন মাত্বর রয়েছেন তিনি যয়ীফ।

কাতার থেকে একজন মুসল্লিকে পেছনে টেনে নেওয়ার বিধান :

আমরা উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে জানতে পারলাম যে কাতারের পেছনে একাকী সলাত বাতিল। তাই কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়ানো জায়েয নয়।

কেউ যদি মাসজিদে জামা'আত ধরতে এসে কাতার পূর্ণ পায় এবং অন্য কোনো আগত মুসল্লিকেও না পায় যাকে নিয়ে পেছনে কাতার করবে তখন তিনি কী করবেন? উত্তর হ'ল তিনি কাতার থেকে একজন মুসল্লিকে দু'বাহু ধরে পেছনে টেনে নেবেন এবং তাকে নিয়ে দু'জনে মিলে কাতার করবেন।

কাতার থেকে একজন মুসল্লিকে টেনে নেওয়ার দলীলসমূহ নিম্নরূপ :

❖ *অধ্যক্ষ, হোসেনপুর দারুল হুদা সালাফিয়্যাহ মাদরাসা, দিনাজপুর*

[৪৯] *আল-আওসাত্ব-১৯৬৪ শারহু মাআনিল আসার-২১৪৪ হাসান (স্বয়ং)*

[৫০] *মুছন্নাফ ইবনু আবী শাইবাহ, হা : ৫৮৮৯ সহীহ*

[৫১] *মুছন্নাফ ইবনু আবী শাইবাহ, হা : ৫৮৯০ সহীহ*

[৫২] *মুছন্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা : ২৪৮৩, যয়ীফ*

১ম দলীল :

জামা'তের মুসল্লিদেরকে নাবী ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন, 'তোমাদের ভাইয়ের হাতের স্পর্শে তোমরা নরম হও :'

(حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، وَحَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ أَتَمُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قُتَيْبَةُ: عَنْ أَبِي [ص:١٧٩] الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي شَجَرَةَ - لَمْ يَذْكُرِ عن ابْنَ عُمَرَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ - لَمْ يَقُلْ عِيسَى بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ - وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ»، ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " مَعْنَى وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ: إِذَا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الصَّفِّ فَذَهَبَ يَدْخُلُ فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُلِينَ لَهُ كُلُّ رَجُلٍ مَنْكِبَيْهِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ .

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা কাতার সোজা কর এবং পরস্পরে কাঁধ সমান কর, ফাঁকা বন্ধ কর, তোমাদের ভাইয়ের হাতের স্পর্শে তোমরা নরম হও এবং শাইত্বনের জন্য কাতারে কোনো ফাঁকা জায়গা রাখবে না। এবং যে কাতার যুক্ত রাখবে আল্লাহ তাকে রহমত দ্বারা যুক্ত রাখবেন এবং যে কাতার বিচ্ছিন্ন করবে আল্লাহ তাকে রহমাত থেকে বিচ্ছিন্ন করবেন।[৫৩]

আবূ দাঊদ বলেন, "তোমাদের ভাইয়ের হাতের স্পর্শে তোমরা নরম হও" হাদীসের এ অংশের অর্থ হ'ল যখন কোনো লোক কাতারের দিকে আসবে এবং কাতারে ঢুকতে শুরু করবে তখন কাতারে অবস্থিত প্রত্যেক লোকের উচিৎ তার জন্য কাঁধদ্বয় নরম করা যাতে সে কাতারে প্রবেশ করতে পারে।[৫৪]

[৫৩] *আবূ দাউদ, হা : ৬৬৬ সহীহ-আলবানী*

[৫৪] *আবূ দাউদ, হা : ৬৬৬*

এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন, শারহু উমদাহ-১/২৪১ মানাভী ফাইযুল ক্বদীরে-২/৭৫, তাইসীরে-১/৩৭৯ বাদরুদ্দীন আল-'আইনী হানাফী 'উমদায়-৮/৪৬৭, শারহু আবী দাউদ-৩/২১৭।

আল্লামা শাওকানী (রহিমাহুল্লাহ)-এর ব্যাখ্যা :

(ولينوا بأيدي إخوانكم) أي إذا جاء المصلي ووضع يده على منكب المصلي فليكن له بمنكبه وكذا إذا أمره من يسوي الصفوف بالإشارة بيده أن يستوي في الصف أو وضع يده على منكبه فليستو. وكذا إذا أراد أن يدخل في الصف فليوسع له.

"তোমাদের ভাইয়ের হাতের স্পর্শে তোমরা নরম হও " (এর ব্যাখ্যায় শাওকানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,) যখন কোনো মুসল্লি এসে আপন হাত কাতারের কোনো মুসল্লির কাঁধে রাখবে তখন সে তার কাঁধকে আগত মুসল্লির প্রতি নরম করবে এবং এইভাবে যিনি হাতের ইশারায় কাতার সোজা করতে আদেশ করবে তখন সে কাতার সোজা করবে বা কাঁধে হাত রাখলে সে কাতার সোজা করবে আর এভাবে তিনি কাতারে প্রবেশ করতে চাইলে যেন জায়গা প্রশস্ত (ফাঁকা) করে দেয়।[৫৫]

মুহাম্মাদ শামসুল হাক্ব 'আজীমআ-বাদী (রহিমাহুল্লাহ)-এর ব্যাখ্যা :

(ولينوا) أي كونوا لينين هينين منقادين (بأيدي إخوانكم) أي إذا أخذوا بها ليقدموكم أو يؤخروكم حتى يستوي الصف لتنالوا فضل المعاونة على البر والتقوى ويصح أن يكون المراد لينوا بيد من يجركم من الصف أي وافقوه وتأخروا معه لتزيلوا عنه وصمة الانفراد التي أبطل بها بعض الأئمة.

(**ولينوا**) অর্থাৎ তোমরা নরম হও, অনুগত হও (**بأيدي**) (**إخوانكم**) অর্থাৎ যখন তোমাদের ভাইয়েরা তাদের হাত দিয়ে তোমাদেরকে ধরবে তোমাদের সামনে

[৫৫] *নাইলুল আওতার-৩/২৩১*

পেছনে করে কাতার সোজা করার জন্য; যাতে তারা ভাল ও তাক্বওয়ার কাজে সহযোগিতার ফজীলত পায়।

তবে সঠিক অর্থ হবে, যিনি তোমাদের কাউকে কাতার থেকে হাত দিয়ে পেছনে টানবেন তার জন্য তোমরা নরম-অনুগত হও; মানে তোমরা পেছনে এসে তার সাথে মিলিত হও, যাতে তোমরা তার একাকী সলাত আদায়ের ত্রুটি দূর করতে পার। কেননা কিছু ইমাম (কাতার ছাড়া) একাকী সলাত আদায়কারীর সলাত বাতিল বলেন।[৫৬]

আমরা মনে করি, রসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী "তোমাদের ভাইয়ের হাতের স্পর্শে তোমরা নরম হও" এর ব্যাখ্যায় আলিম-ওলামার উপরোক্ত মতামত সবটাই ভাল। তবে সঠিক ও মূল উদ্দেশ্য হ'ল কাতার পূর্ণ থাকাবস্থায় পরে আগত মুসল্লি একাকী হলে তিনি কাতার থেকে একজন মুসল্লিকে বাহু ধরে পেছনে টেনে আনবেন এবং তাকে পাশে নিয়ে সলাত পড়বেন। তাহলে তারা দু'জনে মিলে এক কাতার হবে যেমনটা বলেছেন শামসুল হাক্ব 'আজীমআবাদী এবং তাকে সমর্থন করেছেন মোল্লা আলী ক্বারী এবং উবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী (রহমাহুমুল্লাহ)।

এতে কাতার থেকে যে ব্যক্তিকে টেনে আনা হবে তিনি সামনের কাতারে অংশগ্রহণ করার পূর্ণ সাওয়াব পাবেন এবং পরে আগত ব্যক্তির ডাকে সাড়া দেওয়ার কারণে তাক্বওয়ার কাজে সহযোগিতার সাওয়াব পাবেন এবং রসূলুল্লাহ ﷺ এর আদেশ মানার কারণেও তিনি অনুগত বান্দা হিসাবে অনেক সাওয়াবের অধিকারী হবেন ইনশা আল্লাহ।

কাতার থেকে একজন ব্যক্তি সরে আসার কারণে সেখানের ফাঁকা জায়গা কাতারের অন্য লোকেরা পূরণ করে নেবেন। তাহলে তারাও রসূলের আদেশ পালন এবং আনুগত্য প্রকাশের সাওয়াব পাবেন ইনশা আল্লাহ।

কাতার থেকে একজনকে টেনে নেয়ার ব্যাখ্যাটি সঠিক কেন?

আবূ দাউদে বর্ণিত উক্ত হাদীসটির বর্ণনা পরস্পরা খেয়াল করলে তাই বুঝা যায়। যেমন আল্লাহর নাবী ﷺ প্রথমেই কাতার সোজা করার আদেশ করেছেন, কাঁধ সমান করার আদেশ করেছেন, এরপর ফাঁকা জায়গা বন্ধ করতে আদেশ করেছেন, তারপর বলেছেন, 'তোমাদের ভাইয়ের হাতের স্পর্শে তোমরা নরম হও'। কাতার সোজা করা, সমান হওয়া এবং ফাঁকা জায়গা বন্ধের পর সেখানে প্রবেশ করা কঠিন, তাই প্রবেশের চেয়ে একজনকে টেনে নিয়ে দু'জনে মিলে কাতার করবে এটা বুঝানোই হাদীসাংশটি উদ্দেশ্য।

এবার দেখুন, তোমাদের ভাইয়ের হাতের স্পর্শে তোমরা নরম হও' এই কথার পর নাবী ﷺ বলেছেন, আর শাইত্বনের জন্য কাতারে কোনো ফাঁকা জায়গা রাখবে না এবং যে কাতার যুক্ত রাখবে আল্লাহ তাকে রহমত দ্বারা যুক্ত রাখবেন এবং যে কাতার বিচ্ছিন্ন রাখবে আল্লাহ তাকে রহমাত থেকে বিচ্ছিন্ন রাখবেন।' এর অর্থ হ'ল একজনকে কাতার থেকে টেনে নিলে তার জায়গাটা ফাঁকা থাকবে সেই ফাঁকা জায়গাটা তখন কাতারের অন্যান্য মুসল্লিদেরকে পূরণ করে নিতে হবে সলাত চলাকালীন অবস্থায়ই। তা না হলে তারা কাতার বিচ্ছিন্ন করার অপরাধে অপরাধী হবেন, শাইত্বনের জন্য জায়গা রেখে তাকে আমন্ত্রণকারী হবেন। তাই সেই ফাঁকা জায়গা কাতারের অন্যান্য মুসল্লিদের পূরণ করা কর্তব্য-দায়িত্ব আল্লাহর রসূলের ﷺ নির্দেশ অনুযায়ী। সর্বাধিক ভাল আল্লাহ জানেন।

চলবে ইনশা আল্লাহ

ঈমানী দুর্বলতার কারণ :

১. ঈমানী পরিবেশ থেকে দীর্ঘদিন দুরে থাকা।

২. সৎ ও অনুকরণযোগ্য ব্যক্তি হতে দুরে থাকা।

৩. শারঈ জ্ঞান ও ঈমানী বই হতে দুরে থাকা।

৪. গুনাহগারদের মাঝে অবস্থান করা।

৫. দুনিয়ার মোহে মগ্ন হওয়া।

৬. ধন-সম্পদ ও পরিবার নিয়েই মেতে থাকা।

৭. উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা বিলাসী আকাঙ্ক্ষা।

৮. বেশি খাওয়া, বেশি ঘুম, বেশি কথা, অধিক রাত্রিজাগরণ, কাঠিন্যতা।

[৫৬] *'আওনুল মা'বূদ-২/২৫৮, শারহু মিরআতুল মাফাতিহ-৪/৪১ মিরকাত-৪/২০৫*

মানবজীবনে তাক্বওয়ার গুরুত্ব, মুত্তাক্বীদের ইহ ও পরকালীন পুরস্কার এবং মুত্তাক্বী হওয়ার উপায়।

আবু মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ★

পূর্ব প্রকাশের পর থেকে শেষ পর্ব

▪ মুত্তাক্বীদের পরকালীন পুরস্কার :

১. মুত্তাক্বীরা নিরাপত্তার সাথে জান্নাতের অধিবাসী হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ "নিশ্চয়ই মুত্তাক্বীরা নিরাপদ স্থানে থাকবে।"[৫৭]

২. মুত্তাক্বীদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত রাখা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও, যার পরিধি হচ্ছে আসমান ও যমীন। যা তৈরি করা হয়েছে মুত্তাক্বীদের জন্য।"[৫৮]

৩. মুত্তাক্বীরা নহর প্রবাহিত জান্নাতে বসবাস করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾

"বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এ সবের চাইতেও উত্তম বিষয়ের সন্ধান বলব? যারা আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহর নিকট তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত; তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আর রয়েছে পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনীগণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন।"[৫৯]

৪. মুত্তাক্বীদেরকে দলে দলে জান্নাতে নেওয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾

"যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করেছ, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছাবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে : তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক। অতঃপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো।"[৬০]

৫. মুত্তাক্বীরা আল্লাহর মেহমান হিসেবে মর্যাদা লাভ করবে।আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا﴾

"সেদিন দয়াময়ের কাছে মুত্তাক্বীদেরকে অতিথিরূপে সমবেত করব।"[৬১]

৬. মুত্তাক্বীদের জন্য জান্নাতে কক্ষের ওপর কক্ষ (বহুতল ভবন) দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَعْدَ اللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ﴾

"কিন্তু যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, তাদের জন্যে নির্মিত রয়েছে প্রাসাদের ওপর প্রাসাদ। এ গুলোর তলদেশে নদী প্রবাহিত। আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করেন না।" [৬২]

৭. মুত্তাক্বীদের জন্য আল্লাহর কাছে রয়েছে যোগ্য আসন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ۝ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾

"আল্লাহভীরুরা থাকবে জান্নাতে ও নির্ঝরিণীতে। যোগ্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে।"[৬৩]

★ *শিক্ষার্থী, আক্বীদা ও দাওয়াহ বিভাগ, মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব।*

[৫৭] *সূরা আদ-দুখান, আয়াত : ৫১*

[৫৮] *সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৩৩*

[৫৯] *সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৫*

[৬০] *সূরা আয-যুমার, আয়াত : ৭৩*

[৬১] *সূরা মারইয়াম, আয়াত : ৮৫*

[৬২] *সূরা আয-যুমার, আয়াত : ২০*

[৬৩] *সূরা ক্বামার, আয়াত : ৫৫*

৮. মুত্তাক্বীরাই হবে জান্নাতের উত্তরাধিকারী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا﴾

"এটা ঐ জান্নাত; যার অধিকারী করব আমার বান্দাদের মধ্যে মুত্তাক্বীদেরকে।"[৬৪]

৯. জান্নাতকে মুত্তাক্বীদের নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ "জান্নাত মুত্তাক্বীদের নিকটবর্তী করা হবে।"[৬৫]

১০. মুত্তাক্বীদেরকে বেহেশতের আয়তনয়না হুরদের সাথে বিয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ – فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ – يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ – ذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ – يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ – لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ ۖ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ – فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

"নিশ্চয়ই মুত্তাক্বীরা নিরাপদ স্থানে থাকবে। উদ্যানরাজি ও নির্ঝরিণীসমূহে। তারা পরিধান করবে চিকন ও পুরু রেশমীবস্ত্র, মুখোমুখি হয়ে বসবে। এরূপই হবে এবং আমি তাদেরকে আনতলোচনা স্ত্রী দেব। তারা সেখানে শান্ত মনে বিভিন্ন ফল-মূল আনতে বলবে। তারা সেখানে মৃত্যু আস্বাদন করবে না, প্রথম মৃত্যু ব্যতীত এবং আপনার পালনকর্তা তাদেরকে জাহান্নামরে আযাব থেকে রক্ষা করবেন। আপনার পালনকর্তার কৃপায় এটাই মহাসাফল্য।[৬৬]

১১. আল্লাহ মুত্তাক্বীদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾

"অতঃপর আমি মুত্তাক্বীদেরকে উদ্ধার করব এবং জালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব।"[৬৭]

১২. মুত্তাক্বীদের বন্ধু ছাড়া কিয়ামতের দিন অন্য সকল বন্ধু শত্রুতে পরণিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾

"বন্ধুরা সেদিন একে অপরের শত্রু হবে, মুত্তাক্বীরা ছাড়া।"[৬৮]

১৪. মুত্তাক্বীদের জন্য প্রতশ্রিুত জান্নাতে পরিষ্কার ও সুপেয় পানি, অবিকৃত স্বাদের দুধ, স্বাদরে শরাব এবং স্বচ্ছ মধু এ চার ধরনের নহর প্রবাহিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾

"মুত্তাক্বীদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তার অবস্থা হল- তাতে আছে পানির নহর, নির্মল দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। সেখানে তাদের জন্যে আছে রকমারি ফল-মূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা। মুত্তাক্বীরা কি তাদের সমান, যারা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি অতঃপর তা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেবে? "[৬৯]

১৫. মুত্তাক্বীরা সৃষ্টিকুলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ﴾ "আর যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করছে, তারা কিয়ামত দিবসে তাদের উপরে থাকবে।"[৭০]

মুত্তাক্বী হওয়ার কিছু উপায় :

১. বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত ও তা নিয়ে গবেষণা করা।

কুরআন তিলাওয়াত ও গবেষণার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ পরিচয়, ক্ষমতা, মর্যাদা, দয়া, কঠোরতা, জান্নাত, জাহান্নাম, কবরের শাস্তি ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। আর তখনই অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হয়।

---

[৬৪] *সূরা মারইয়াম, আয়াত : ৬৩*
[৬৫] *সূরা আশ-শুআরা, আয়াত : ৯০*
[৬৬] *সূরা দুখান, আয়াত : ৫১-৫৭*
[৬৭] *সূরা মারইয়াম, আয়াত : ৭২*
[৬৮] *সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত : ৬৭*
[৬৯] *সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত : ১৫*
[৭০] *সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২১২*

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَ جِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ﴾

"মু'মিন তো তারাই, যাদের সামনে আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় ভীত হয়, যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন তা তাদের ঈমানের উন্নতি সাধন করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের ওপর ভরসা করে।"[৭১]

২. মুখলিস আলেম হওয়া অথবা আলেমদের সংস্পর্শে থাকার চেষ্টা করা।

আল্লাহকে আলেমরাই অধিক ভয় করে, আলেমরা নবীদের উত্তরসূরী। তাই মুখলিস আলেম হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء﴾

"বান্দাদের মধ্য থেকে তারাই আল্লাহ তা'আলাকে বেশি ভয় করে যারা আলেম/ জ্ঞানী।" [৭২]

৩. মুত্তাক্বী বা সত্যবাদী বান্দাদের সাহচর্য লাভ করা।

যারা ভাল ও সৎ মানুষ, তাদের সঙ্গ নেওয়া। কারণ সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। ভাল মানুষের সঙ্গে থাকলে ভাল কাজ করা যাবে, পাপ থেকে বাঁচা যাবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও।"[৭৩]

৪. আল্লাহ সবকিছু দেখছেন এ কথা মাথায় রেখে সকল কাজ করা।

আমরা যে কাজই করি না কেন, করার আগে যদি আল্লাহ দেখছেন এ কথা চিন্তা করি, তাহলেই অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগবে। অনুরূপভাবে জাহান্নাম, করবের শাস্তির কথা চিন্তা করলেও অন্তরে ভীতি আসবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখ তিনি তোমাদের সকল কর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত রয়েছেন।"[৭৪]

৫. আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে ইবাদত করা।

দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর আদেশ পালন ও নিষেধাজ্ঞা বর্জনে কাজে লাগাতে পারলে অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হয়। আর ইবাদতে মনোযোগ তৈরি হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون﴾

"হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর। যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন ; যাতে তোমরা মুত্তাক্বী হতে পার।"[৭৫]

❁ পরিশেষে বলতে চাই,

তাক্বওয়া মু'মিনের একটি মূল্যবান গুণ। দুনিয়া ও পরকালে আল্লাহর কাছে মুত্তাক্বীরা সবচেয়ে সম্মানিত। আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মানার মাধ্যমেই তাক্বওয়াশীল হওয়া যায়। দুনিয়ার মোহে পতিত হয়ে আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার নাম মুত্তাক্বী নয়। চারদিকে এখন হারাম, অন্যায়ের ছড়াছড়ি ; এমত অবস্থায় ঈমান ও আমল টিকিয়ে রাখা আমাদের জন্য খুবই কষ্টকর। সুতরাং আমরা সতর্ক ও সচেতন হয়ে সর্বাবস্থায় তাক্বওয়া অবলম্বন করে জীবন-যাপনের চেষ্টা করব। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মুত্তাক্বী হওয়ার তওফীক দান করুন। আমিন!! দু'আ কামনায়। ❑❑

[৭১] *সূরা আল-আনফাল, আয়াত : ২*
[৭২] *সূরা আল-ফাতির, আয়াত : ২৮*
[৭৩] *সূরা আত-তাওবা, আয়াত : ১১৯*
[৭৪] *সূরা আল-হাশর, আয়াত : ১৮*
[৭৫] *সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২১*

তাজিকিস্তানে মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ বন্ধ হোক

শেখ আহসান উদ্দিন ★

সাম্প্রতিক সময়ে এশিয়া ও আফ্রিকার কিছু দেশের অবস্থা ভালো নয়। গাজা ও রাফাহসহ ফিলিস্তিনে সাড়ে ৮ মাস ধরে দখলদার যায়নবাদী ইসরাইলীদের আগ্রাসন ও দখলদার ইসরাইলী বাহিনীর জবাবে তুফানুল আকসা নামে প্রতিরোধ যুদ্ধ চলছে। এর পাশাপাশি সুদান ও নাইজেরিয়াসহ আফ্রিকার কয়েকটি দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট চলছে। বুরকিনা ফাসোসহ কয়েকটি আফ্রিকান দেশে সামরিক শাসন চলছে। এসবের পাশাপাশি বর্তমানে তাজিকিস্তানের মুসলিমদের অবস্থাও খুবই দুঃখজনক, বিশেষ করে সেদেশের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ব্যাপক হস্তক্ষেপ চালাচ্ছে বলে অভিযোগ শোনা গিয়েছে। তাজিকিস্তানের বর্তমান এই পরিস্থিতি নিয়েই সংক্ষিপ্ত এ প্রবন্ধ।

মধ্য এশিয়া বা সেন্ট্রাল এশিয়ায় অবস্থিত অন্যতম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ তাজিকিস্তান। তাজিকিস্তানের রাজধানী দুশানবে। এ রাষ্ট্রটির ৮৬% জনগণ তাজিক, ১১.৩% উজবেক এবং ৩.১% কিরগিজ সহ অন্যান্য জনগোষ্ঠীর লোক। তাজিকিস্তানের আশপাশে কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, কিরগিজস্তান, চীন, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান রয়েছে। মধ্যযুগে তাজিকিস্তান এর ভূখন্ডে তুর্কি, মঙ্গোল ও পারস্য সাফাভী পরবর্তী শাসকদের শাসন ছিল। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে এ অঞ্চলটি ও তাজিক জনগোষ্ঠী রাশিয়ান রাজতন্ত্র বা রাশিয়ান সাম্রাজ্যের অধীনে চলে যায়। ১৯১৬ সালে তাজিক ভূখণ্ডে রাশিয়ান সাম্রাজ্যবিরোধী বিখ্যাত ঐতিহাসিক বাসমাচি আন্দোলন হয়। ১৯১৭ সালে এটা স্বায়ত্তশাসিত তুর্কিস্তানে রূপান্তর হয়। ১৯১৮ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত তাজিকিস্তান সোভিয়েত তাজিক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের অধীনে ছিল। ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত তাজিকিস্তান সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীনে ছিল। সোভিয়েতের পতনের পর ১৯৯১ সালের শেষদিকে তাজিকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে।

তাজিকিস্তানের ৯৬.৪ % মানুষ ইসলাম ধর্মের অনুসারী যাদের মধ্যে ৯৬% সুন্নি মুসলিম বা আহলুস সুন্নাহর অনুসারী এবং বাকী ৪% ইসমাঈলী শিয়া এবং ৩.৬% মানুষ অমুসলিম বা অন্যান্য ধর্মের অনুসারী।

মুসলিম প্রধান দেশ তাজিকিস্তান একটা গণতান্ত্রিক বা প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র বলে দাবি করলেও ১৯৯৪ সাল থেকে লাগাতার ৩০ বছর ধরে সেদেশে বর্তমানে প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রক্ষমতায় আছে পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি পিডিপিটি এর ইমোমালি রাহমন যিনি একজন সেক্যুলারপন্থী এবং কট্টর তাজিক জাতীয়তাবাদী, ১৯৯৪ এর আগ পর্যন্ত তিনি মার্কসবাদী বামপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতি করতেন। ২০২০ সাল পর্যন্ত সেদেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনগুলোতে এই ব্যক্তিই নিজেকে বিজয়ী দাবি করে ক্ষমতায় রয়েছেন। তাজিকিস্তানের সংবিধানে ধর্ম পালনের স্বাধীনতা অধিকার থাকা সত্বেও ২০০৭ সাল থেকেই ইমোমালি রাহমন এর নেতৃত্বে তাজিকিস্তানের বর্তমান সরকার ধর্মনিরপেক্ষতার নামে কট্টর সেক্যুলারিজম বাস্তবায়ন করার জন্য সেদেশের মুসলিমদের এমনকি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর ব্যাপক হস্তক্ষেপ শুরু করেছে। ২০০৭ সাল থেকে হিজাব, ইসলামি পোশাকের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ শুরু হয় তাজিকিস্তানে। ওই বছর তাজিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলামিক পোশাক এবং পশ্চিমা ধাঁচের মিনিস্কার্ট উভয়ই নিষিদ্ধ করে। পরে সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানে এটি কার্যকর করা হয়। এর পরের বছরগুলোতে হিজাবের ওপর একপ্রকার অলিখিত নিষেধাজ্ঞা কাজ করছিল দেশটিতে।

তখন থেকে বর্তমানে কয়েকবার তাজিক জাতীয়তাবাদ ও কট্টর সেক্যুলার মতাদর্শ বাস্তবায়নের জন্য তাজিকিস্তানের মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর অনেক অনেক হস্তক্ষেপ চালানো হয়েছে। সেদেশের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী চরমপন্থা বা সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে হিজাব বা ইসলামী পর্দার ওপর কড়া হস্তক্ষেপ, লম্বা দাড়ি নিষিদ্ধ করা, অনেক আরবী নাম নিষিদ্ধ করা, মাইকে আজান ও কুরআন তিলাওয়াত নিষিদ্ধ করণ,

★ *শিক্ষার্থী বিবিএ দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলাদেশ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় বিআইইউ, ঢাকা।*

৩৫ বছর বয়সের নিচে মক্কায় হজ্জ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা, কয়েকটি মসজিদ ভেঙে সেখানে নাইটক্লাব ও সিনেমা হল তৈরি, এরকম অনেক কর্মকাণ্ড করেছে যা খুবই গর্হিত কাজ। সম্প্রতি তারা সেদেশের ছোট শিশুদের প্রকাশ্যে দুই ঈদ পালন করার ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার মতো অমানবিক নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ডও শুরু করে সেদেশের মুসলিমদের মাঝে প্রচুর আতঙ্ক ও ভয়ভীতি ছড়াচ্ছে। এসবের পাশাপাশি তাজিকিস্তানের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদেশে আই/এস এর মতো সন্ত্রাসী চরমপন্থীদের গোপনে মদদ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে (সোর্স : ইংরেজি গণমাধ্যম সিবিসি নিউজ, আফগানিস্তানের তা-লিবান সমর্থিত আল মিরসাদ মিডিয়া সেন্টার এবং তুরস্ক, ইরান ও আফগানিস্তানের কয়েকটি গণমাধ্যমের খবর)। তাজিকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী একদিকে সেদেশের মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর আঘাত চালাচ্ছে এবং এর পাশাপাশি সেদেশের অনেক যুবক এসব কারণে আই-এস এর মতো সন্ত্রাসী খারেজীদের ফাঁদে পা দিচ্ছে। সেদেশের জনগণ তাজিকিস্তানের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর জুলুম অত্যাচারের ভয়ে তাদের বিরুদ্ধে তেমন কোনো আন্দোলনও করতে পারছে না।

তাজিকিস্তানের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক সন্ত্রাসবাদ দমনের নাম করে কট্টর সেক্যুলার মতাদর্শ বাস্তবায়নের জন্য সেদেশের মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করছে। এর কিছু তালিকা দিলাম :

১। ২০০৭ সাল থেকে সেদেশের শাসকগোষ্ঠী হিজাব নিকাবসহ ইসলামী পোশাকের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণা শুরু করে। তখন তাজিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় মহিলা শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইসলামিক পোশাক এবং পশ্চিমা ধাঁচের মিনিস্কার্ট উভয়ই নিষিদ্ধ করে। পরে সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানে এটি কার্যকর করা হয়। ২০১৫ সাল থেকে উগ্রবাদ সন্ত্রাস দমনের নামে কালো হিজাব বোরখার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। হিজাব সংক্রান্ত অঘোষিত নিষেধাজ্ঞার পরে সম্প্রতি মে-জুন ২০২৪-এ তাজিকিস্তানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতালসহ পাবলিক প্লেসে সেদেশের নাগরিকদের হিজাবের ওপর কড়াকড়ি নিষেধাজ্ঞা দিয়ে বসে।

২। সেদেশে অনেক আরবী নাম, মাইকে বা লাউডস্পিকারে আযান এবং মহিলাদের মুখ ঢাকা বা নিকাবকে নিষিদ্ধ করে সেদেশের প্রশাসন।

৩। তাজিকিস্তানে ৫০ থেকে ৫০০ মিটারের মধ্যে কোনো মসজিদ নির্মাণের ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, ৫০ থেকে ৫০০ মিটারের মধ্যে কোনো মসজিদ থাকলেই সেগুলো গুঁড়িয়ে ভেঙে ফেলে।

৪। সেদেশে বড় ও লম্বা দাঁড়ি রাখা নিষিদ্ধ,যারা রাখে তাদের পুলিশ কর্তৃক থানায় নিয়ে গিয়ে শেভ করিয়ে ছাটিয়ে দেয়।

৫। সেদেশে ৩৫ বছরের নীচের যেকোনো নাগরিকের হজ্ব পালন নিষিদ্ধ। এমনকি হজ্ব পালনের জন্য সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নেয়ার জন্য অনেক আগে থেকে আবেদন করতে হয়। তাজিকিস্তানে গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে খুব অল্প সংখ্যক মানুষকে প্রতি বছর হজ্বের অনুমোদন দেয়া হয়।

৬। সেদেশে একমাত্র জানাযার নামাজ ছাড়া প্রকাশ্যে যেকোন ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ইবাদত নিষিদ্ধ করা হয়েছে, ২০১০ সালের পর থেকে সেদেশে ১৮ বছরের নীচে কোনো নাগরিকের মসজিদসহ ধর্মীয় উপাসনালয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ।

৭। সেদেশের ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল ইসলামী রেনেসা পার্টি অব তাজিকিস্তান-এর বিরুদ্ধে প্রচুর ক্র্যাকডাউন চালিয়ে ২০১৫ সালে তাদেরকে সন্ত্রাসী সংগঠন অপবাদ দিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়।

৮। সেদেশের মসজিদগুলোতে জুমার খুতবায় তাজিকিস্তানের বর্তমান বিতর্কিত শাসক প্রেসিডেন্ট ইমোমালি রহমানের প্রশংসা করার পক্ষে কড়াকড়ি আরোপ করেছে। তাজিকিস্তানের অনেক মুসলিম আলেম ওলামার ব্যাপক চাপের মধ্যে রেখেছে সেদেশের সরকার। অনেক আলেমকে জেল-জুলুম অথবা দেশত্যাগ করতে বাধ্যও করেছে।

৯। সেদেশের মুসলিম নাগরিকদেরকে তাজিকিস্তানের বাইরে মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা মিসরের আল-আযহারসহ বিদেশের কোনো ইসলামী

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা বিদেশের মাদ্রাসায় অধ্যায়ন করার বিরুদ্ধে কড়া হস্তক্ষেপ দিয়েছে। তাজিকিস্তানের মসজিদগুলোতে নতুন করে ইমাম নিয়োগ বন্ধ বলা চলে।তাজিকিস্তানের বাইরে কোনো দেশের মাদ্রাসায় অধ্যায়নরত তাজিক নাগরিকদের সেদেশের মসজিদে ইমাম ও খতিব হতে দেয় না।

১০। সম্প্রতি পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষে নতুন আইন প্রস্তাবনা করে ছোট শিশুদের প্রকাশ্যে দুই ঈদ পালনের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে এবং ভবিষ্যতে তাজিকিস্তানে দুই ঈদের ছুটি বিদেশি অপবাদ দিয়ে বাতিল করেছে।

১১। অনুমতি ছাড়া ইসলামী বই প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আছে এমনকি তাজিকিস্তানে প্রকাশিত কোনো ইসলামী বই বিদেশে আমদানি রফতানির ওপর কড়া বিধিনিষেধ রয়েছে। ইসলামী সংগঠন সংস্থা বানানোর ওপর অনেক কড়াকড়ি আরোপ করেছে। এসবের পাশাপাশি সেদেশের সংখ্যালঘু ইসমাঈলী শিয়াদের প্রার্থনা ও জামাতখানার বিরুদ্ধে কড়া নিষেধাজ্ঞাও দিয়েছে। খ্রিস্টানদের ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপরও সেদেশে ব্যাপক হস্তক্ষেপ চালিয়েছে।

এসব দেখেই বোঝা যায়, তাজিকিস্তানের মুসলিমরা খুবই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। তাজিকিস্তানের জনগণ এসব কারণে হতাশ হয়ে পড়ছে। তাজিকিস্তানে সঠিক ইসলামী শিক্ষার অভাব শোনা যাচ্ছে। এসবের সুযোগেই তাজিকিস্তানে আইএসের মতো খারেজী সন্ত্রাসীগুলো লোকদের ব্রেনওয়াশ করছে। তাজিকিস্তানের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আফগানিস্তান, উজবেকিস্তান ও কাজাখস্তানসহ আশপাশের কয়েকটা দেশ খুবই রাগান্বিত ও বিব্রতও বটে। অভিযোগ এসেছে, বর্তমানে এই তাজিকিস্তান রাষ্ট্রটি আফগানিস্তান থেকে আগত বেহায়া নর্তকী এবং আই-এস এর সন্ত্রাসীদের আশ্রয়স্থল হয়ে গেছে।

২০২১ সালের আগস্টে আফগানিস্তানে তালিবান ক্ষমতায় আসার পরে আফগানিস্তান, ইরান, উজবেকিস্তান, রাশিয়া ও তুরস্কে আই-সিস বা দায়েশ খোরাসান প্রোভিন্স এর যত সন্ত্রাসী হামলা সংঘটিত হয়েছিল সেসবের ব্যাপারে তথ্য নিয়ে জানা যায়, এসব দেশগুলোতে আই/সিস (ISIS) এর সন্ত্রাসী জঙ্গি হামলার সাথে যারা সম্পৃক্ত ছিল তাদের অধিকাংশই তাজিকিস্তান এর নাগরিক এবং আফগানিস্তান, তুরস্ক ও ইরানের বর্তমান সরকার তাজিকিস্তান থেকে আগত সেসব সন্ত্রাসীর কঠিন শাস্তিও দিয়েছে। তাজিকিস্তানের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা শুরু করেছে পার্শ্ববর্তী দেশ আফগানিস্তান, উজবেকিস্তান ও কিরগিজস্তান।

ইতোমধ্যে আফগানিস্তানের বর্তমান তালিবান সরকার সমর্থক অনেক আলেম-ওলামা তাজিকিস্তানের বর্তমান স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ডাকও দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘ কর্তৃক তাজিকিস্তানের বিরুদ্ধে ধর্মীয় স্বাধীনতা লঙ্ঘনের যে অভিযোগ দিয়েছে তা খুবই সত্য। পাকিস্তান ও ইরানের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী যেভাবে না জেনে বুঝেই তাজিকিস্তানের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর সাথে বেশি খাতির রাখছে তা খুবই দুঃখজনক। তাজিকিস্তানের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ ও তাজিকিস্তানের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক একইভাবে গোপনে আই/এস বা আইসিস-কেপির সন্ত্রাসীদের রফতানি করছে সেটার বিরুদ্ধে পাকিস্তান সৌদি আরব ও ইরানসহ বড় বড় মুসলিম দেশগুলোর শাসকরা প্রতিবাদ করুক এই আশা করছি। তাজিকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যেন হিজাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা, ছোট শিশুদের দুই ঈদ পালনের ওপর নিষেধাজ্ঞাসহ ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর যত হস্তক্ষেপ করেছে সেগুলো যেন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় সেজন্য ওআইসি, রাবেতায়ে আলামী বা মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ, জাতিসংঘ, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন এবং তাজিকিস্তানের পার্শ্ববর্তী দেশ রাশিয়া, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, কিরগিজস্তান ও আফগানিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও আলেম-ওলামার শক্তিশালী পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ। অন্যথায় তাজিকিস্তানের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর ওপর স্যাংশন বা নিষেধাজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে বলে মনে করি। মহান আল্লাহ তা'আলা তাজিকিস্তানের মুসলিমদের বর্তমান দূরবস্থা থেকে রক্ষা করুন (আমিন)। ❑❑

ন্যায় বিচারের একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত

অধ্যাপক মোঃ আবুল খায়ের★

পৃথিবীতে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন দাউদ (আলাইহিস সালাম) এবং তাঁর পুত্র সুলাইমান (আলাইহিস সালাম)-কে বিপুল শক্তি ও রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা দুজনকেই নবুওয়াত ও মানুষের মাঝে বিচার ফায়সালা করার প্রজ্ঞা দান করেছিলেন।

বর্তমান ফিলিস্তিনসহ সমগ্র ইরাক ও সিরিয়া এলাকায় তাদের রাজত্ব ছিল। পৃথিবীর অতুলনীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তাঁরা ছিলেন সর্বদা আল্লাহ তা'আলার প্রতি অনুগত ও সর্বদা কৃতজ্ঞ। দাউদ (আলাইহিস সালাম) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সেই বান্দা যাকে খুশী হয় পিতা আদম (আলাইহিস সালাম) নিজের বয়স থেকে ৪০ বছর কেটে তাঁকে দান করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নিকট সুপারিশ করেছিলেন এবং সে অনুযায়ী দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর বয়স ৬০ বছর হতে ১০০ বছরে বৃদ্ধি পায়। [৭৬]

আল্লাহ রব্বুল আলামীন দাউদ (আলাইহিস সালাম)-কে আধ্যাত্মিক ও দৈহিক শক্তিতে বলিয়ান করে সৃষ্টি করেছিলেন। এটির প্রমাণ সূরা স্ব-দ এর ১৭ নং আয়াতে বর্ণিত আছে। তাছাড়া দাউদ (আলাইহিস সালাম)-কে আল্লাহ তা'আলা যাবুর কিতাব প্রদান করেছিলেন। আল্লাহ তাঁকে এত সুমধুর কণ্ঠস্বর দান করেছিলেন যা অন্য কাউকে দেননি, ফলে সাগরের মাছ পর্যন্তও তাঁর সুর শুনতে চলে আসতো।

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক প্রিয় সালাত হচ্ছে দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর সালাত এবং সর্বাধিক প্রিয় সিয়াম হচ্ছে দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর সিয়াম। তিনি একদিন অন্তর একদিন সিয়াম পালন করতেন। শত্রুর মোকাবেলায় তিনি কখনও পশ্চাদবরণ করতেন না। [৭৭]

সম্মানীত পাঠকমণ্ডলী! অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পিতার তুলনায় ছেলে বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন হয়। ঠিক এরূপ অবস্থা হয়েছিল নবী দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর সুযোগ্য পুত্র সুলাইমান (আলাইহিস সালাম)-এর ক্ষেত্রে। অবশ্য সবই সেই মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ইচ্ছা তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই এরূপ জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা দান করেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন নবী দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর তুলনায় পুত্র সুলাইমান (আলাইহিস সালাম)- কে বিচার ফায়সালা করার প্রজ্ঞা দান করেছিলেন বেশি। ফলে সুলাইমান (আলাইহিস সালাম)-এর বিচারের ফায়সালায় মানুষ খুশী হত। নিম্নে দু-একটি বিচারের ফায়সালা সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

মেষপাল ও শস্যক্ষেতের মালিকের বিচার : এ বিচারের ফায়সালা অর্থাৎ শস্যক্ষেত্রের ফায়সালাটি তাঁরা উভয়েই করেছিল। ফায়সালা ছিল ওয়াহীভিত্তিক। তবে সুলাইমান (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে এ ফায়সালার যে ওয়াহী নাযিল করা হয়েছিল তা দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর ওপর অবতীর্ণ ওয়াহীকে রহিত করে দিয়েছিল। কেউ বলেছেন, এটা ওয়াহীভিত্তিক ছিল না বরং ইজতিহাদভিত্তিক ছিল। দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর ইজতিহাদভিত্তিক ছিল। দাউদ (আলাইহিস সালাম) ইজতিহাদে সঠিক করতে পারেননি, অবশ্য তাকে তিরস্কার করা হয়নি। অন্যদিকে পুত্র সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) ইজতিহাদে সঠিক করেছিলেন, এ জন্য তাঁকে প্রশংসা করা হয়েছে। [৭৮]

ইমাম বগভী, হযরত ইবনু আব্বাস, কাতাদাহ, ও যুহরী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক রাজ্যের কোনো এক অঞ্চল থেকে দু'জন লোক দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট এক মামলা নিয়ে মীমাংসার জন্য আসে। তাদের একজন ছিল মেষপালের মালিক এবং অন্যজন ছিল শস্যক্ষেতের মালিক। দাউদ (আলাইহিস সালাম) তাদের অভিযোগ পেশ করতে বললেন। বাদী বললেন, জনাব আমার মাত্র একটিই চাষাবাদের জমি। এই জমি থেকে যে ফসল আসে তা দিয়েই আমি আমার পরিবারের সংসার চালাই আর এই বিবাদীর এক পাল মেষ আছে তিনিও দুধ বিক্রি করে সংসার চালান। শস্যক্ষেতের মালিক মেষ পালের মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করল যে, তার মেষপাল রাত্রিবেলায় আমার শস্যক্ষেতে প্রবেশ করে সম্পূর্ণ ফসল নষ্ট করে দিয়েছে। আমি এর প্রতিকার চাই।

দাউদ (আলাইহিস সালাম) একজন নাবী হওয়ার সাথে সাথে একজন বাদশাহও ছিলেন। সেজন্য এ সকল অভিযোগের ফায়সালাও তাঁকে করতে হত। তাই তিনি বিবাদীকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাদী যে অভিযোগ পেশ কররো তা কি সত্য? বাস্তবতা স্বীকার করে বিবাদী বললো, জনাব ঘটনা সত্যি। কিন্তু আমি তো ইচ্ছা করে আমার মেষপালকে তার জমিতে ছেড়ে দেইনি। সুতরাং আমার দিকটিও একটু বিবেচনা করবেন।

উভয়ের নিকট হতে সমস্ত ঘটনা শোনার পর দাউদ (আলাইহিস সালাম) বিবাদীকে লক্ষ্য করে বললেন, যেহেতু তোমার মেষপাল তার জমির সমস্ত ফসল খেয়ে নষ্ট করে দিয়েছে, এজন্য অবশ্যই তোমাকে তার ফসলের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর যেহেতু ক্ষতিপূরণ দেওয়ার মতো তোমার অন্য কোনো অর্থ সম্পদ নেই তাই তোমার এই মেষপাল তাকে দেয়া হলো। এই বলে দাউদ (আলাইহিস সালাম) বিচারের ফায়সালা দিয়ে দিলেন। সম্ভবত শস্যের মূল্য ও মেষপালের মূল্যের হিসাব সমান বিবেচনা করে দাউদ

★ সহকারী অধ্যাপক, বোয়ালিয়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজ, কলারোয়া।
সাতক্ষীরা ও খতীব মুরারী কাটি জমঈয়তে আহলে হাদীস জামে মসজিদ।

[৭৬] তিরমিযী, মিশকাত, হা : ১১৮, ৪৬৬২, সনদ সহীহ

[৭৭] সহীহ বুখারী, হা : ১০৭৯, মিশকাত, হা : ১২২৫

[৭৮] তাফসীর ফাতহুল মাজিদ পৃ: ৫০৫-৫০৬ ২য় খণ্ড

عليه السلام এই ফায়সালা দিয়েছিলেন। বাদী ও বিবাদী উভয়ে এ ফায়সালা শুনে দাউদ عليه السلام এর আদালতকক্ষ থেকে বের হয়ে আসলেন। আসার সময়ে দরজার মুখে পুত্র সুলাইমান عليه السلام-এর সাথে দেখা হয়। তিনি মোকাদ্দামার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা সব বিষয় খুলে বলল। ঘটনা শুনে সুলাইমান عليه السلام এ ফায়সালার সাথে একমত হলেন না। তিনি পিতার কাছে গিয়ে বললেন, আমি যদি ফায়সালা দিতাম তাহলে ভিন্নরূপ হত এবং উভয়ের জন্য কল্যাণকর হত। কেননা আপনার এই ফায়সালার কারণে জমিওয়ালা ব্যক্তি ভীষণ লাভবান হবে আর মেষপালনওয়ালা ব্যক্তি চরম ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কারণ হল, কিছু দিনের মধ্যেই জমিওয়ালা ব্যক্তির জমি আগের মতই হয়ে যাবে। অর্থাৎ জমিতে আবার ফসল উৎপাদন হবে, কিন্তু মেষপালের মালিক আর কখনই তার মেষপাল ফেরৎ পাবে না। ফলে জমিওয়ালার জমি ঠিকই থাকলো, শুধু মেষপালের মালিক ফকির হয়ে গেল।

ছেলের এ পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা শুনে দাউদ عليه السلام অবাক হয়ে গেলেন। অতঃপর বললেন, তাহলে তুমি বল দেখি এর ফায়সালা কিভাবে হবে? সুলাইমান عليه السلام বললেন, আমার ফায়সালা হল মেষেরপালটি জমির মালিককে সাময়িকভাবে দিয়ে দেওয়া হোক। সে মেষগুলোর দুধ বিক্রি করে তা দ্বারা সংসার চালাবে। আর শস্যের ক্ষেতটি মেষপালেরর মালিককে দিয়ে দেওয়া হোক। সে তাতে ফসল উৎপাদন করুক। অতঃপর শস্যক্ষেত যখন মেষপালের বিনষ্ট করার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে, তখন তা জমির মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং মেষপালটি পুনরায় তার মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

দাউদ عليه السلام পুত্র সুলাইমান عليه السلام-এর এ রায়টি শোনার পর অত্যন্ত খুশী হলেন এবং রায়টি অধিক উত্তম হিসেবে গণ্য করে সেটাকেই কার্যকর করার নির্দেশ প্রদান করেন। এতে বাদী বিবাদীসহ আদালতে উপস্থিত সকলেই এ রায়কে ন্যায়সঙ্গত এবং ইনসাফপূর্ণ ফায়সালা বলে মেনে নিলেন। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এদিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেন :

﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ () وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾

অর্থ, স্মরণ কর দাউদ ও সুলাইমানের কথা যখন তারা কৃষিক্ষেত সম্পর্কে বিচার করছিল যখন তাতে রাতের বেলা কোনো ব্যক্তির মেষপাল ঢুকে পড়েছিল, আর আমি তাদের বিচারকার্য প্রত্যক্ষ করেছিলাম। আমি সুলাইমানকে এ বিষয়ে (সঠিক) বুঝ দিয়েছিলাম আর তাদের প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম বিচারশক্তি ও জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান।[৭৯]

সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী! দাউদ عليه السلام উপযুক্ত বিচার না করতে পারায় তাঁকে কিন্তু তিরষ্কার করা হয়নি বরং প্রশংসা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন: তাঁদের প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। এজন্যই রাসূল ﷺ বলেছেন : যখন বিচারক বিচার করতে যেয়ে ইজতিহাদ করে, যদি ইজতিহাদ সঠিক হয় তাহলে দুটি নেকী পাবে, আর যদি ভুল হয় তাহলে একটি নেকী পাবে।[৮০]

সন্তানের প্রাপ্যতা নিয়ে আর একটি মামলা : ঘটনাটি আবূ হুরায়রা رضي الله عنه বর্ণনা করেছেন। রাসূল ﷺ বলেন : দু'জন মহিলা ছিল যাদের সাথে তাদের দু'জন পুত্র সন্তান ছিল। হঠাৎ একটি বাঘ এসে তাদের একজনের ছেলেকে বাঘে ধরে নিয়ে যায়। তখন সঙ্গের একজন মহিলা বলল, তোমার ছেলেটিকেই বাঘে ধরে নিয়ে গেছে। অন্য মহিলাটি বললো, না, বরং বাঘে তোমার ছেলেটিকে নিয়ে গেছে। এভাবে তারা দু'জনই সন্তানের দাবি করতে থাকলো। অবশেষে তারা দু'জনই বাদশা দাউদ عليه السلام-এর নিকট এ বিরোধ মীমাংসার জন্য বিচারপ্রার্থী হয়ে একটি মুকাদ্দামা পেশ করলেন। ঘটনা শুনে তিনি ফায়সালা দেন যে, শিশুটি বড় স্ত্রীলোকটির প্রাপ্য। অতঃপর তারা দুজনই আদালত কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে পুত্র সুলাইমান عليه السلام-এর নিকট সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। সুলাইমান عليه السلام ঘটনা শুনে তাদেরকে বললেন একটা ছুরি নিয়ে এসো। এই শিশুকে কেটে দু'টুকরা করে দু'জনকেই দিয়ে দিব। এ কথা শোনার সাথে সাথেই ছোট স্ত্রী লোকটি বললো, আল্লাহ তা'আলা আপনার ওপর রহম করুন। এটি তার সন্তান একে কাটবেন না। অতঃপর সুলাইমান عليه السلام সহজেই বুঝতে পেরে সন্তানকে ছোট মহিলার অনুকুলে দিয়ে বিচারের ফায়সালা করে দেন।[৮১]

পরিশেষে বলা যায়, সুলাইমান عليه السلام বালক হলেও কী হবে? ওপরের দুটো বিচারের ক্ষেত্রে কতই না সুন্দর ফায়সালা দিয়ে দিলেন। যে ফায়সালা শুনে সবাই সন্তুষ্ট হয়েছেন। অবশ্য এ বুদ্ধিজ্ঞান তিনি মহান সেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ হতে পেয়েছেন। তিনি যাকে ইচ্ছে করেন; তাকে এই জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেন। তাই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট আবেদন, তিনি যেন আমাদেরকে জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা বৃদ্ধিপূর্বক ভাল ভাল কাজে ব্যবহার করার তাওফীক দান করেন। আমীন। ❑❑

---

[৭৯] *সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত : ৭৮-৭৯*

[৮০] *সহীহ বুখারী, হা : ৭৩৬২, সহীহ মুসলিম, হা : ১৭১৬*

[৮১] *সহীহ বুখারী, হা : ৩৪২৭, সহীহ মুসলিম, হা : ১৩৪৪*

প্যারেন্টিং : অভিভাবকের দায়িত্ব

মীযান মুহাম্মদ হাসান *

প্যারেন্ট ইংরেজি শব্দ। গুগলের যুগে আমরা গুগল সার্চ করে দেখতে পারি, গুগল কী লিখেছে, 'একটি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে যাঁদের ভূমিকা থাকে এবং যাঁদের ওপর শিশু নির্ভর করে, তাঁদেরকে প্যারেন্টস বলা হয়।'

আবহমানকালের চিরাচরিত প্রথা হলো- সন্তান লালন পালনে মায়ের ভূমিকাই মুখ্য। সময়ের ব্যবধানে নারী ও পুরুষ উভয়ে যখন কর্মমুখী, সারাক্ষণ ব্যস্ত অফিস আদালত কিংবা ব্যবসায়; তখন সন্তান লালন পালনের গুরুদায়িত্বটি হয়ত পালন করছেন তাদের নানা নানি; দাদা দাদি অথবা অন্য কেউ।

কর্মব্যস্ত জীবনে একজন পুরুষ সারাদিন বাইরে অফিসে, ব্যবসায় কিংবা খেত-খামারে মাঠে সময় দিচ্ছেন। তার জন্য ঘরে সময় দেওয়া বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলা, ঘোরাঘুরি করা, কোথাও বেড়াতে যাওয়া চাইলেও এসব আর সম্ভব হচ্ছে না। হয়ে উঠছে না।

একই সঙ্গে এখনকার মায়েরাও যেহেতু কর্মসচেতন, আত্মসচেতন। সুতরাং তারাও কর্মী হচ্ছেন, কাজ করছেন, অফিস আদালতে ব্যবসায় ঝুঁকছেন। তাই চাইলেও তারা ঘরে সময় দিতে পারছেন না। সম্ভব হয়ে উঠছে না। সুতরাং সন্তানের দেখভাল করার সময় সুযোগ হয়ে উঠছে না। ফলে আমাদের অবহেলা অনাদরে অকাতরে বখে যাচ্ছে আমাদের আদরের ছেলে-মেয়ে। তবে কীভাবে আমরা প্যারেন্টিং বা সন্তান লালন পালন করব?

এভাবে নিজেদের অজান্তেই আমাদের শিশুরা মাতৃস্নেহের অভাব বোধ করছে। তাদের মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তারা সঠিক পরিচর্যায় বেড়ে উঠছে না। অনেক সময় কাজের বুয়া বা বেবিকেয়ারের তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হবার কারণে শিশুরা তাদের মতো আচার আচরণ করতে শুরু করছে। বখে যাচ্ছে। বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। বিপদগামী হচ্ছে আমাদের অজান্তেই।

দৈনিক পত্রিকাগুলো বলছে, অভিভাবকদের সচেতনতার অভাবে অনেক ছেলে-মেয়ে বখে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে তাদের আচরণ, চলাফেরা। তারা গভীর রাত পর্যন্ত বাইরে সময় পার করছে। পড়াশোনাও করছে না নিয়মিত।

আরো ভয়াবহ চিত্র হচ্ছে, বাংলাদেশের প্রায় সত্তর লাখ মানুষ মরণব্যাধি মাদকে আসক্ত। যার আশি শতাংশ যুবক।[৮২]

এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থীরাও আজ মাদকে আসক্ত।[৮৩]

অনুমান করা যায়, কীভাবে আমাদের সন্তানরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম! ইসলাম সন্তান লালন পালনের ক্ষেত্রেও আমাদেরকে দিয়েছে দিকনির্দেশনা। কুরআনে কারিমে আল্লাহ তা'আলা বলেন হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেরা বাঁচো। তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।[৮৪]

হযরত আলি রা. এ আয়াতের তাফসিরে বলেন, তোমরা নিজেরা উত্তম জিনিস শিখো। তোমাদের পরিবার পরিজনকে উত্তম জিনিস শিক্ষা দাও।[৮৫]

উল্লিখিত আয়াত ও হাদিসের ব্যাখ্যা থেকে আমরা জানতে পারলাম, সন্তানকে ভালো ও উত্তম জিনিস শেখানো আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

এজন্য অভিভাবক হিসাবে আমাদেরকে সন্তানের জন্য আদর্শ শিক্ষা ও তার নৈতিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করাও জরুরি। নয়ত সন্ত্রাসবাদ, মাদক

* লেখক : ইসলাম বিষয়ক গবেষক ও সাংবাদিক, সাবেক খতিব, বৈরসগীরচালা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, শ্রীপুর, গাজীপুর

[৮২] ০২/০২/১৮ দৈনিক ইত্তেফাক
[৮৩] ১৬/০৩/১৭ বাংলাদেশ প্রতিদিন
[৮৪] সূরা আত-তাহরিম, আয়াত : ০৬
[৮৫] মুস্তাদরাকে হাকিম, হা : ৩৮৬২

ইয়াবার মতো ভয়াবহ অন্যায় ও অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়বে আমাদের সন্তানরা।

গত ২৯ ফেব্রুয়ারি রাজধানী ঢাকার বেইলি রোডে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা কারো অজানা নয়। যেখানে অভিশ্রুতি শাস্ত্রী নামের একটি মেয়ের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তার বাবা তাকে মুসলিম বলে দাবি করেছেন। তার নাম হলো বৃষ্টি খাতুন। মেয়েটি একটি কলেজে পড়াশোনা করতেন। পাশাপাশি সাংবাদিকতা করতেন অনলাইন জার্নাল-এ। দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন শিরোনাম করেছে, 'অভিশ্রুতি না বৃষ্টি এখনও অজানা' মূল সংবাদে তারা বলছে, রমনার কোনো মন্দিরের সভাপতি দাবি করেছেন, অভিশ্রুতি সনাতন ধর্মাবলম্বী।[৮৬]

চিন্তার বিষয় হচ্ছে, মা বাবা তাকে পড়াশোনার জন্য পাঠিয়েছেন। কিন্তু বেচারি তার দীন ধর্ম আদর্শ এমনকি নামও পরিবর্তন করে ছেড়েছেন। ঠিক এভাবেই আমাদের অবহেলার কারণে আমাদের সন্তানও যে ধর্মীয় পরিচয় বাদ দিয়ে কখন কীভাবে বিধর্মী হয়ে উঠবে, আছে কী আমাদের কোনো খবর? আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করুন আমাদেরকে।

সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ বলেন- তোমরা সাত বছর বয়সে সন্তানকে নামাজের আদেশ করো। দশ বছর বয়সে নামাজ আদায় না করলে। শাসন করো। এ হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, সন্তানের শিক্ষার বয়সটাও শৈশবে হওয়া উচিত। এজন্য শৈশবে সন্তানদেরকে আদর্শ শিক্ষা, নীতি নৈতিকতার জ্ঞান, বড়দের শ্রদ্ধা-সম্মান করা ইত্যাদি শেখানো কর্তব্য। অন্যথায় তারা বখে যেতে পারে।

সেই সাথে পারিবারিক বন্ধন, সন্তানকে সময় দেওয়া, তার সঙ্গে কথা বলা ইত্যাদি বিষয়ে খোঁজ খবর নেওয়াও একজন সচেতন অভিভাবকের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

অন্যথায় ডিপ্রেশনে পড়ে, মানসিক বিকার থেকে কিংবা হীনমন্যতা থেকে যে কোনো সময় আমার আপনার সন্তান নষ্ট হতে পারে। বখাটে উগ্র হয়ে যেতে পারে। বেছে নিতে পারে আত্মহত্যার মতো ভয়াবহ পথও। যা ইদানীং খুব বেশি ঘটে চলছে আমাদের এই সমাজে।

এজন্য প্রতিটি বাবা-মার দায়িত্ব হলো- সন্তানের সুশিক্ষা ও আদর্শ জীবন যাপন নিশ্চিত করা। যা সন্তানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকারও। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিকভাবে সন্তানের অধিকারগুলো আদায় ও প্রতিপালন করার তাওফিক দান করুন। আমিন। ❑❑

[৮৬] *০৪/০৩/২৪ দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন*

ঈমানী দুর্বলতার চিকিৎসা :

১. কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা।

২. মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর বড়ত্ব অনুভব এবং তাঁর নাম ও গুনাবলীর চিন্তা করা।

৩. শরীআহর জ্ঞানার্জন এবং ঈমানী বইয়ের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি।

৪. নিয়মিত ইসলামী আলোচনায় উপস্থিত হওয়া।

৫. বেশি বেশি নেক আমল করা ও নেক কাজে প্রতিযোগিতা করা।

৬. বিভিন্ন ধরনের ইবাদত (শারীরিক, আর্থিক) আত্মনিয়োগ করা।

৭. খারাপ পরিণতির আশঙ্কা করা ও শেষ পরিণতির ব্যাপারে সতর্কতা।

৮. বেশি বেশি মৃত্যুর স্মরণ, জানাজা, দাফন ও জিয়ারতে অংশ নেয়া।

৯. পরকালের মঞ্জিল যেমন : কিয়ামত, পুলসিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম নিয়ে চিন্তা করা।

১০. প্রাকৃতিক কোনো ঘটনা দেখলে পরকালের চিন্তা করা। যেমন : মেঘ, সূর্য, চন্দ্র ও এদের গ্রহণ।

১১. সর্বদাই আল্লাহর স্মরণ বা জিকির।

১২. মোনাজাত বা একাগ্রভাবে আল্লাহকে ডাকা।

১৩. কামনা-বাসনা কম করা।

১৪. আল্লাহর নির্দেশসমূহের পতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

১৫. অন্তরে আল্লাহকে ভালোবাসা, ভয় করা, তাঁর প্রতি সুধারনা ও ভরসা পোষণ করা, তাঁর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা ও তাঁর নিকট তাওবা করা। ❑❑

মহিয়সী নারী হাজেরা :

সাইদুর রহমান*

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয়বন্ধু ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে আদেশ করেন যে, তার স্ত্রী হাজেরা ও দুগ্ধপোষ্য সন্তান ইসমাইলকে মক্কা নগরীতে ছেড়ে আসতে।

মক্কা নগরী বর্তমানের ন্যায় এত চিত্তাকর্ষক ও মনোরম ছিল না। ছিল না রাস্তার ধারে সারি সারি ল্যাম্পপোস্ট ও আধুনিকতার ছোঁয়া।

তদানীন্তন সময়ে মক্কা নগরীর নাম শুনলেই মানুষের গা শিউরে উঠতো। জনমানবহীন শূন্য নগরী, নেই লোকের সমাগম, চারদিকে শুধু ধু ধু মরুভূমি। চোখ যতদূর যায়, এর সীমার মাঝে নেই কোনো ঘরবাড়ির দেখা।

দ্বিপ্রহরের খাঁ খাঁ রোদের তাপ যেন আগুনের ফুলকি; হাঁটা চলা মুশকিল। পানির অপর নাম জীবন। এই পানির নহর বা কুপ কিছুই নেই সেখানে।

আশপাশে রয়েছে নানা প্রজাতির হিংস্র জানোয়ারের আবাস। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেই শুরু হয় তাদের প্রলয়ংকারী ভয়ঙ্কর হাঁকডাক। মাঝে মাঝে আঘাত হানে সাইমুম। সত্যিই এই নগরীর নাম শুনলেই গায়ের পশম সটান হয়েই দাঁড়িয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেছেন। আর প্রত্যেকটি পরীক্ষায় তিনি সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এবারও তিনি পিছপা হননি, বুলি আউড়িয়ে দেননি, 'যথেষ্ট হয়েছে, আর পারবো না'।

সবকিছু ছেড়ে দিতে প্রস্তুত তিনি, কিন্তু প্রভুকে ছাড়তে নারাজ। কারণ তিনি তো পেয়েছিলেন ঈমানের মিষ্টতার স্বাদ! সবার কথা অন্ধকারের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করা যায়, কিন্তু প্রভুর কথা যায় না, প্রভুর কথাই শিরোধার্য।

প্রভু যখন তাদের ছেড়ে আসতে আদেশ করেছেন, তখন কোনো কালক্ষেপণ না করে সাথে সাথে সফরের পাথেয় প্রস্তুত করা শুরু করেন তিনি। সন্তানের পরম মমতায় ভালোবাসার মায়াজাল তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরতে পারেনি।

রওনা দিলেন পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিন থেকে মক্কায়। বহু পাহাড়- পর্বত, উঁচু-নিচু ভূমি পাড়ি দিচ্ছেন তারা। প্রখর রোদের তাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত। একেবারে নিস্তেজ হয়ে আসছে শরীর; তথাপি বিরামহীনভাবে চলছে পায়ের বাহন।

আশ্চর্য লাগে! কীভাবে তারা যানবাহন ছাড়া শত শত কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছেন! সরু পথ বেয়ে ছুটেছেন গন্তব্যপানে! আল্লাহু আকবার।

তারে ঈমানী জজবা কত মজবুত ছিল! বহু কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথ মাড়িয়ে শেষমেষ ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) মরুদ্যান মক্কায় পৌছলেন।

বিভীষিকাময় স্থান মক্কা। আশপাশ জুড়ে একটি মানুষও নেই! এই নির্জন নগরীতে কীভাবে দু'জন অবলা অবস্থান করবে?

কে তারে দেখভাল করবে? কার কাছে বিপদে পড়লে মাথা গোঁজাবে? কে তারে ঠাঁই দেবে ? কে তাদের দুঃখে সান্তনার বাণী শোনাবে? কে তাদের প্রয়োজন পূরণ করবে?

এরকম হাজারো হতাশাব্যঞ্জক আত্মকথন উঁকি দিল তার হৃদয়ের আঙিনায়। কিন্তু আদেশ যে রবের পক্ষ থেকে; পালন করতেই হবে। এই ধরণীর বুকে সবচেয়ে বেশি যে তাকে ভালোবাসি; তাঁর কথার কদর করি, ফেলে দিতে পারি না তাঁর কথা।

চলে যেতে চায় না মন, তবু চলে যেতে হয়। শত চাপা কষ্ট ও তিমিরকে উপেক্ষা করে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) মক্কায় তাদের রেখে ছুটে চললেন ফিলিস্তিন পানে।

চলে যাচ্ছেন প্রাণাস্পদ মোদের একা ফেলে! হাজেরা (আলাইহিস সালাম)ও স্বামীর পিছু পিছু ছুটছেন। বাচ্চা শিশুর মতো পিছন থেকে করুণ সুরে ডাকছেন, অঝোরে অশ্রুপাত করছেন; বারবার বলছেন, 'আপনি বিনা মোদের জীবন অর্থহীন, ফিরে যাচ্ছেন মোদের অথৈ সাগরে ফেলে, যে সাগরের নেই কূলকিনারা! আমাদের তরি তো ভাঙা, কীভাবে পাড়ি দিব এই ভয়ংকর নদী। আমরা যখন নিধনকারী ঝড়ের সম্মুখীন হবো, তখন কে আমাদের সামনে দাঁড়াবে হাতিয়ারের মতো? মানুষের আনাগোনাহীন এই মরুপ্রান্তরে ছেড়ে যাচ্ছেন মোদের, যেখানে ক্ষণে ক্ষণে ধেয়ে আসে হায়েনাদের বজ্ররব।'

কিন্তু না, স্বামী ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) শুনছেন না স্ত্রী হাজেরার এই ব্যথাতুর অভিব্যক্তি; এমনকি একবারের জন্য পেছনে

* সাবেক ছাত্র, এম এম আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

ফিরেও তাকাচ্ছেন না। পরিশেষে ব্যর্থ মনোরথে হাজেরা ﷺ ইবরাহীম ﷺ-কে বললেন, 'ইবরাহীম হে! আপনি কি আমাদের প্রতি রুষ্ট হয়ে এই বিপদসংকুল স্থানে রেখে যাচ্ছেন, নাকি আল্লাহর আদেশে এই কাজ করছেন'?

ইবরাহীম ﷺ সহসাই দাঁড়িয়ে গেলেন। বুকফাটা কান্না চেপে রেখে সম্মুখ পানে চেয়ে বললেন,

'আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন তোমাদের এখানে রেখে যেতে'।

ব্যাস, আর কিছুই তিনি বললেন না। প্রত্যুত্তরে হাজেরা ﷺ কালবিলম্ব না করে সাথে সাথে বললেন,

'তাহলে আল্লাহ আমাদের কখনোই ধ্বংস করবেন না'।

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর ওপর আস্থা ও অটুট বিশ্বাস থাকলেই একটা মানুষ এই কঠিন পরিস্থিতিতে এমন জাদুকারী কথন উচ্চারণ করতে পারে! মাথার ওপর থেকে ছায়া চলে গেছে, তাতে কী আসে যায়, ছায়ার মালিক তো আছেন মোদের সাথে; তিনি ফিরিয়ে দিবেন ছায়া। ঘন অন্ধকার, নেই জোছনার দেখা-সাক্ষাৎ, কোনো ভয় নেই, তিনি এই তিমির রজনীতে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটাতে সক্ষম। ফিরিয়ে আনতে পারবেন সোনালী চাঁদের ঝলকানি।

তারপর তিনি আল্লাহর ওপর ভরসা করে এই অচেনা অপরিচিত মরুপ্রান্তরে অবস্থান করতে লাগলেন। যে দিকে তাকান, সেদিকেই বিশাল বিশাল পর্বতমালা। ফজরের আবছা আবছা অন্ধকারে কেউ যদি এসকল পর্বতমালার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তাহলে সে মনের অজান্তেই চেতনা হারিয়ে ফেলবে! এমন ভয়ানক দেখতে মনে হয়।

চোখ মেলে তাকালে হাজেরা ﷺ সম্মুখ পানে কিছুই দেখতে পান না। তার আশেপাশে কোনো বসতি নেই। দুচোখের দুয়ারে তিনি শুধু তার কলিজার টুকরাকেই দেখতে পান।

তিনি ভগ্নহৃদয়ে সন্তানকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো হাউমাউ করে কাঁদতে থাকেন। ভরদুপুরে রোদের প্রখরতা তার মনকে আরো বিষন্নতায় ফেলে দেয়। তিনি মনে মনে ভাবেন এই তপ্ত রোদে কীভাবে বেঁচে থাকবেন! তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। নেই তৃষ্ণার্ত হৃদয়কে সিক্তকরণে এক পশলা বৃষ্টি। দেখা মিলছে না মেঘপুঞ্জের।

মাঠে নেই তৃণলতা, বালিয়াড়ি আর বালিয়াড়ি। নিজের সাথে বিদ্যমান জলটুকু ক্রমেই ফুরিয়ে যাচ্ছে। মহামুসিবত! জল না থাকলে তো বেঁচে থাকা দায়।

দিনের আলোবিলীন হয়ে যখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, তখন তার মন আরো শঙ্কিত হয়ে ওঠে; অস্থির হয়ে ওঠে হৃদয়ের বালির বাঁধ। এই বুঝি আচানক ঢেউ এসে খানখান করে দেয় বাঁধকে, ভেঙে চুরমার করে দেয় হৃদয়ের আঙ্গিনায়কে। এই বুঝি অন্ধকার ভেদ করে কোনো হিংস্র জন্তু থাবা মেরে ছিনিয়ে নিয়ে যায় তার আদরের দুলালকে; শেষ করে দেয় তাদের জীবনায়ুকে।

দুশ্চিন্তার কালো মেঘ তাকে ঘিরে ধরে। আসবাবপত্র শেষ হয়ে গেলে কোত্থেকে তিনি জোগাড় করবেন, কার কাছে যাবেন। ওই সময়ে তার অতীত স্মৃতি কথা চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ভেসে ওঠে। তিনি মনে মনে বলতে থাকেন,

'হাজেরা আজ কোথায় পড়ে আছে! আমিতো থাকতাম প্রাচীর ঘেরা সুরম্য প্রাসাদে, যার কারুকার্য ছিল নান্দনিক, চিত্তাকর্ষক, মন ভোলানো চাকচিক্য! প্রসারিত ছায়াবিশিষ্ট উদ্যান, তরুলতায় ভরপুর, পুরো প্রাসাদে ছিল সমাদর, ছিল হাস্যোজ্জ্বল বদনে চলাফেরার সুযোগ! রোদের প্রখরতা তো খুঁজে পাওয়া মুশকিল ছিল। পূর্বাহ্ন ও অপরাহ্নে ছিল ঝুড়িভর্তি ফলমূলের ব্যবস্থা। ইচ্ছে করলেই হাত বাড়িয়ে যা ইচ্ছা নিতে পারতাম!

মনের সুখে গাইতে পারতাম, চলতে পারতাম যেখানে সেখানে! ঝিঁঝিঁ পোকার ন্যায় মিটমিট করে ভিবা ছড়াতাম প্রাসাদের আঙিনায়! আজ আমি এক মহা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছি। আমার পাশে নেই সেই ছায়াবিশিষ্ট উদ্যান, অট্টালিকা, নেই সবুজ বৃক্ষরাজি; ক্ষুধা নিবারনের যথেষ্ট আহার্য'!

এই অভিব্যক্তিগুলো নিজ সত্তাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলছিলেন আর অঝোরে দু'চোখ থেকে অশ্রুর ফোয়ারা বইছিল! বেয়ে পড়ছিল গন্ডদেশ পেরিয়ে বক্ষে। মনের কষ্ট চাপা রেখেছিলেন তিনি। স্বামীর বিরহে ধৈর্য ধারণ করেছেন, পণ্যের প্রত্যাশা করেছেন মহান রবের কাছে।

তিনি বিশ্বাস করতেন এটা প্রভুর পক্ষ থেকে একটা বড় পরীক্ষা। তিনি বিশ্বাস করতেন আল্লাহ তাকে কখনো এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য করবেন না। তিনি তনুমনে বিশ্বাস করতেন আল্লাহ তাকে কখনো বিনাশ করবেন না।

সত্যিই তার এই ঈমানী দৃঢ়তার বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে খরকুটোর ন্যায় বিলীন করে দেননি। রেখে দিয়েছেন তাকে চিরস্মরণীয় নারীদের কাতারে। তার এই অশ্রু ব্যর্থ

হয়নি; তার এই ভগ্ন হৃদয়ের অশ্রু আল্লাহ এতো পছন্দ করেছেন যে, তিনি তাকে পরবর্তী নারীকুলের জন্যে রোল মডেল হিসেবে রেখে দিয়েছেন; পরিণত করেছেন তাকে অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বে।

এদিকে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ব্যথাতুর হৃদয় নিয়ে গমন করছেন ফিলিস্তিন পানে। সইতে পারছেন না সন্তান ও সহধর্মিনীর বিরহের যাতনা! একেবারে সংকীর্ণ হয়ে আসছে ধরণি! চোখেমুখে আবছা আবছা দেখছেন তিনি।

বৃদ্ধ বয়সে আমতা আমতা 'বাবা' ডাক শুনেছেন তিনি। এরই মাঝে পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। বারবার মনে পড়ছে ছোট্ট ইসমাইলের অস্ফুট 'আব্বু আব্বু' ডাক! মনে পড়ছে স্ত্রীর ভালবাসার পরশের কথা। সবসময় থেকেছে তারা চোখের মণিকোঠায়, ক্ষণিকের জন্য আড়াল হতে দেননি তিনি। দৃষ্টিসীমার বাইরে গেলেই মন ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে উঠতো।

তিনি তাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে গিয়ে আল্লাহর কাছে কিছু অভিব্যক্তি, কিছু করুণ আর্তনাদ প্রকাশ করেছিলেন; যে কথাগুলো আল্লাহ মোটাদাগে নোট করে রেখেছেন এবং আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে ওহী মারফত জানিয়েছেন। তিনি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছিলেন এভাবে,

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ .

'হে আমার রব! আমি আমার বংশধরদের আপনার পবিত্র ঘরের নিকট এক অনুর্বর উপত্যকায় রেখে গেলাম। হে আমার পালনকর্তা! যেন তারা সালাত আদায় করে। অতএব, তুমি মানুষের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে তোল এবং ফলফলাদি দিয়ে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করো।'[৮৭]

এদিকে হাজেরা আলাইহাস সালাম এই বিজন মরুভূমিতে অবস্থান করছেন। জীবন বাঁচানোর জন্য পাথেয় হিসেবে তার কাছে রয়েছে এক ঝুড়ি খেজুর ও যৎসামান্য জল। দিন যাচ্ছে আর এগুলো কমছে। এক পর্যায়ে জল শেষ হয়ে যায়।

এদিকে শিশু ইসমাইলকে পেয়ে বসেছে প্রচন্ড তৃষ্ণা। তৃষ্ণার দহনে কাতর তিনি। সজোরে শিশুসুলভ আচরণ করে রোদন করতে লাগলেন। বলুন, মা জননীর মন কি মানে? বাচ্চা পিপাসার যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে আর স্নেহময়ী মা বসে থাকতে পারে? হাজেরা আলাইহাস সালাম-এর হৃদয়ের দরিয়ায় উথালপাতাল ঢেউ শুরু হয়ে যায়। প্রবল ঢেউ তার অন্তরকে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। পালাক্রমে ঢেউ আসছে। আর টিকতে না পেরে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

কিছু একটা উপায় অবলম্বন করতে হবে, রুখে দাঁড়াতে হবে ঢেউয়ের মোকাবেলায়, প্রতিহত করতে হবে এই পর্বতসম ঢেউ। পানি অন্বেষণে হন্যে হয়ে ছুটছেন তিনি। মরুভূমির প্রান্তরে জল খুঁজছেন। ক্ষুধার যাঁতাকলে পিষ্ট এক অবলা নারী। একবার যাচ্ছেন সাফা পর্বতমালায়। না, সেখানে জল নেই। আবার যাচ্ছেন মারওয়া পর্বতমালায়। সেখানেও জল নেই। মরীচিকা চোখের কোণে জল হয়ে ধরা দিচ্ছে বারবার।

এক পর্বতে উঠলে মরীচিকাকে মনে হয় জল। আবার তিনি দৌড় দেন জলের সন্ধানে; কিন্তু না, সেখানেও জলের লেশমাত্র নেই। ব্যর্থ মনোরথে ফিরে আসেন প্রতিবার তিনি। জলের সন্ধানে সাফা ও মারওয়া পর্বতমালায় সাত চক্কর দেন।

শিশু ইসমাইলের বুকফাটা কান্নায় আকাশ বাতাস (ভারী হয়ে আসে)। সজোরে তিনি পদাঘাত করছেন জমিনে। আর সেখান থেকে ধূলিকণা উড়ছে। কিছুতেই থামছে না তার কান্না। মায়ের মন তো মানে না। দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে জল তলব করছেন তিনি।

দৌড়ঝাঁপ দিয়ে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত। কোথাও পেলেন না এক ফোটা জল। কী দিয়ে সান্ত্বনা দিবেন বাচ্চাকে! তিনি ভেবে অস্থির। চোখে সব কিছু ঝাপসা ঝাপসা দেখছেন। দিবসকে মনে হচ্ছে তার কাছে তমসাচ্ছন্ন গভীর রজনী। ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে তিনি চলে আসেন শিশু ইসমাইলের নিকট। এসেই তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন! কী আশ্চর্য! ছেলের জমিনে পদাঘাতের স্থান থেকে স্বচ্ছ নির্মল জলরাশি প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন! তার মলিন চেহারায় ফুটে উঠলো এক চিলতে আনন্দের হাসি। খুশিতে মাতোয়ারা হয়ে উঠলেন চারপাশ। তার উৎফল্লতার সৌরভে

[৮৭] *সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ৩৭*

সুবাসিত হলো সবকিছু, যেন তিনি পেলেন তিমির রজনীতে এক দীপ্তিময় আলোকচ্ছটা; যার ঝলকানীতে বিদূরিত হয় সব ঘোর অন্ধকার।

ছেলের তৃষ্ণা নিবারণের লক্ষ্যে তিনি তাকে মুখে তুলে দিলেন জীবনরক্ষাকারী পানি। নিজেও তৃপ্তি সহকারে পান করে তৃপ্তির ঢেকুর দেন। বাচ্চার রোদন বন্ধ হয়ে যায়। লালচে ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠে এক ঝলক মুচকি হাসি।

হাজেরা আলাইহাস সালাম আল্লাহর অনুগ্রহে কৃতার্থ হলেন; নিজেকে সঁপে দিলেন তার তরে। তিনিই তো উত্তম অভিভাবক। বিপদে-আপদে রক্ষাকারী। তিনি আরশের উর্ধ্বে থেকে অবলোকন করেন বান্দার হৃদয়ের আকুতি, সপ্ত আসমান ভেদ করে প্রেরণ করেন অপার অনুগ্রহ।

হাজেরা আলাইহাস সালাম লক্ষ করলেন ইসমাইল আলাইহিস সালাম-এর চরণতল থেকে অঝোরে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি শঙ্কিত হলেন। মনের মাঝে ধরা দিল একরাশ ভীতি। কালক্ষেপণ না করে সাথে সাথে জলরাশির চতুর্পার্শ্বে বাঁধ দিয়ে দিলেন।

আমাদের প্রাণাস্পদ হৃদয়ের স্পন্দন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

'ইসমাইল জননীর ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করুন, তিনি যদি ওই সময়ে বাঁধ না দিতেন, তাহলে জমজম কূপ একটি দৃষ্টিনন্দন ঝরনায় রূপান্তরিত হতো'।

এই সেই জমজম কূপের ইতিবৃত্ত, যা আমরা পেয়েছি হাজেরা আলাইহাস সালাম-এর শত কষ্টের বদৌলতে। এই কূপের পানি খুব স্বচ্ছ ও সুপেয়। তৃষ্ণা নিবারণের পাশাপাশি এই পানি ক্ষুধাও নিবারণ করে। শরীর ও আত্মার বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক এই পানি। দীর্ঘদিন পর্যন্ত শুধু এই পানি পান করে জীবন ধারণ করা যায়। তনুমনে সজীবতা আসে এই পানির সংস্পর্শে! মনে আনন্দের দোলা লাগে।

প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ হাজি এই পানি পান করেন। বাড়িতে আসার সময় প্রিয়জনদের জন্য বরকতস্বরূপ বোঝাই করে নিয়ে আসে। আজ আমরা কত সহজেই নির্মল এই পানি পাচ্ছি। এর নেপথ্যে কত যে ত্যাগ ও সংগ্রাম লুকায়িত আছে, তা নিয়ে কি আমরা কখনও কল্পনা করি? চিন্তাভাবনার দুয়ার খুলে দেই?

আমাদের এসব নিয়ে গভীর ভাবনার সাগরে ডুব দেয়ার সময় নেই। হাজেরা আলাইহাস সালাম এই পানি পেয়ে সানন্দে জীবনযাপন করছেন। তার কষ্ট লাঘব হয়েছে। এই স্থানে যখন ঝরনা ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল, তখন বিভিন্ন পাখির ঝাঁক আকাশের নীলিমায় উড়াউড়ি করছিল।

ঘটনাচক্রে ওইসময় একটি কাফেলা সেখান দিয়ে অতিক্রম করছিল। বিষয়টি তাদের নজর কাড়ে। তারা ভাবতে লাগল এই জনমানবহীন নগরীতে এতো পাখির আনাগোনা দেখা যাচ্ছে কেন? হয়তো কিছু একটা কৌতূহল এর মাঝে নিহিত রয়েছে !

কাফেলার মধ্য থেকে কিছু লোক কৌতূহলবশত সেখানে যাত্রা করে। কী আশ্চর্য! এই ধু ধু মরু প্রান্তরে তপ্ত বালুকারাশি ভেদ করে সুপেয় জল উদ্গত হচ্ছে! পরক্ষণেই তারা দেখতে পেলো হাজেরা আলাইহাস সালাম- কে।

তার সাথে কুশল বিনিময় করে এখানে বসবাসের অনুমতি চাইলো তারা। তিনি তাদের একটি শর্তসাপেক্ষে এখানে বসবাসের অনুমতি দিলেন, আর তা হচ্ছে জলের স্বত্বাধিকার থাকবে তার করায়ত্তে; এতে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

তার এই প্রস্তাব তারা সানন্দে গ্রহণ করে স্বীয় সঙ্গীদের এখানে নিয়ে আসার জন্য বের হয়ে গেল। তারা চলে আসার পর নির্জন বিরানভূমি হয়ে উঠলো কোলাহলময়, ভীতিকর স্থান রূপ নিল শান্তিময় স্থানে।

হাজেরা আলাইহাস সালাম এখন আর এখানে একা নন; তার সাথে রয়েছে অনেক লোক। তিনি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। যে আল্লাহ মানুষের হৃদয়কে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছেন।

ইবরাহীম আলাইহাস সালাম-এর দু'আ রবের দরবারে মঞ্জুর হয়েছে। আল্লাহর ঘর এই শূণ্য মরুভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের হৃদয়ে এই ঘরের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

প্রত্যেকটা মানুষের মনের একটা টান থাকে মক্কা নগরীতে গমন করার। কাবাঘর নির্মাণের পর থেকে বর্তমান অবধি সব সময় সেখানে মানুষের আনাগোনায় মুখরিত থাকে তার চারপাশ। প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ হাজির 'লাব্বাইক' ধনীতে প্রকম্পিত থাকে মক্কা নগরী। এসব কিছুই সাধিত হয়েছে ধৈর্য ও তাকওয়ার বদৌলতে। ❑❑

শুব্বান পাতা

صفحةالشبان

‘সফলতা’

রিফাত সাঈদ*

‘সফলতা’ সবার কাছেই কাঙ্ক্ষিত শব্দ। ঈপ্সিত গন্তব্য। অন্বিষ্ট সুখের আবাসসম। যেটা অর্জনে সবারই দ্রুত ধাবন। যার প্রতি সবাই উদ্রিক্ত। যার উপচার সঞ্চয়নে গণনাহীন ক্লেশ প্রয়োগ। জীবনের প্রতিটি ধাপেই যেটা পাওয়ার ইচ্ছা ক্রমবর্ধমান। কিন্তু সেই জিনিসটা কী? ক্ষমতা, শক্তি, প্রভাব, পটুত্ব, দক্ষতা, যোগ্যতা, নৈপুণ্য, আধিপত্য, রাজকীয় ক্ষমতা, সম্মান, সম্ভ্রম, পরিচিতি, আকাঙ্ক্ষিত-স্পৃহাপূর্ণ ডিগ্রি অর্জনই কি সাফল্য নাকি এর মানে অন্য কিছু? ধনী এবং ক্ষমতাধর ব্যক্তিটি যদি দিনশেষে অসুখী ও অতৃপ্তই থাকে তাহলে কি তাকে খুব একটা সফল বলা যায়? মনে রাখতে হবে, সুখ বা আনন্দ সাফল্যের চাবিকাঠি নয়। বরং সুখ আর আনন্দ সাফল্যের ছোট্ট উপাদানমাত্র। আসলে এই শব্দটির নিজস্ব গুণ আর বৈশিষ্ট্যেই সজ্জিত, সুন্দর এবং রমণীয়। সেটা ব্যক্তিভেদে অবস্থাভেদে একেকজনের কাছে একেক রকম মনে হয়।

সোপান ১. বাধা-বিপত্তি ও ব্যর্থতার আবরণ চিরে সফলতার মুখ :

জীবনে সফলতার স্বাদ পেতে হলে শত বাধা-বিপত্তি, উৎপাত, উপদ্রব, দৌরাত্ম্য ঝামেলা, অন্তরায়ের উপস্থিতি সত্ত্বেও চেষ্টায় রত থাকতে হবে। এই ‘নিরত’ থাকার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ-- ছোট-বড় নানা রকম ব্যর্থতা, ভুলত্রুটি, নিরুৎসাহের মোলাকাতে বিচলিত না হওয়া। এসব বাধাকে চোখের জল ঝরার কারণ মনে না করে ক্রমাগতভাবে নিজের কাজ কন্টিনিউ করা।

আমেরিকান বিখ্যাত খেলোয়াড় ভিন্স লম্বারডি বলেন-

“সফল মানুষের সাথে অসফল মানুষের প্রধান পার্থক্য শক্তি বা জ্ঞান নয়। পার্থক্যটা হলো সত্যিকার সফল হওয়ার ইচ্ছা।”

এখানে ইচ্ছা বলতে ‘শত বাধা বিপত্তি, ব্যর্থতা, সফলতার রাজপথ থেকে পিছলে যাওয়া, বার বার হোঁচট খাওয়া সত্ত্বেও হতাশা-উচ্চাটনের ছোঁয়ায় কাতর না হয়ে আমি এর সাথে লেগে থাকবই" এরকম প্রতিজ্ঞাকে বুঝানো হয়েছে।

ব্যর্থতা, অসফলতার মধ্য দিয়েই সফলতার উপকরণ রচিত হয়। এগুলোর মাঝ থেকেই সিদ্ধার্থের সাইন-বোর্ড গ্রন্থন এবং চিহ্নিত হয়। প্রতিদিন আমরা অম্বরের গাঁয়ে সূর্য্যের যে ঝলমলে হাসিটা দেখি তার জন্য অংশুওয়ালা সূর্যকে শীতের জমাটবাঁধা কুয়াশার মতো আবরণ চিরে এবং আরো অনেক বাধা অতিক্রম করে সাক্ষাৎ করতে হয় মোদের সাথে। তেমনিভাবে মানুষেরও তার লক্ষ্যে পৌঁছোতে অনেক দুর্গম পথ ও দুর্বোধ্য অবস্থা পাড়ি দিতে হয় এবং অদম্য-অপ্রতিরোধ্যসম চেষ্টায় নিজেকে রত রাখতে হয়।

ব্যর্থতা হতে উত্তরিত হয়ে সফলতার ইতিহাস যারা সৃষ্টি করেছেন, তাদের উদাহরণ দিয়ে শেষ করা যাবে না। সেই সব বিখ্যাত ব্যক্তিদের সফলতার পেছনে জীবনের ঊষালগ্নেই রয়েছে ব্যর্থতার গল্প। কারো কারো জীবনে বড় বড় ব্যর্থতাই সফলতার হাতিয়ার হিসেবে দেখা দিয়েছে। পৃথিবীতে কেউ ব্যর্থকাম হতে চায় না, সবাই সফল হতে চায়। কিন্তু সেই চাওয়া এবং পাওয়ার মাঝে একটা বিরাটকায় পাঁচিল (দেয়াল) দণ্ডায়মান, সেই পাঁচিল পেরিয়ে যে বিজয় নিশান ওড়াতে পারে সেই সফলতার মোলাকাত লাভ করে।

সোপান ২. সফলতার জন্য কঠোর পরিশ্রম এবং প্রয়াস প্রয়োগ :

দুর্বলকে যোগায় শক্তি, দিশেহারাকে দেখায় পথ, অন্ধকারে জ্বালায় আলোর মশাল। হতাশা, ব্যর্থতা, গ্লানির তিক্ত অনুভূতিগুলো যখন মস্তিস্ককে আবেষ্টন করে তখন সামনে পুরোগামী হওয়ার জন্য সম্বল হয় ‘চরম আয়াস ও চেষ্টার প্রতিজ্ঞা’।

সুতরাং, বারংবার চেষ্টা ও পরিশ্রম বৈ কোনো কাজ সম্পূরণ করা সম্ভব নয়।

* শিক্ষার্থী, মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা।

'চরম আয়াস ও পরিশ্রম ছাড়া সফলতা পাওয়া সম্ভব নয়'- এর একটি দৃষ্টান্ত :

ধরুন! একজন লোক দুপুরে লাঞ্চ করতে রেস্টুরেন্টে গেলেন। ভিতরে ঢুকে দেখলেন রেস্টুরেন্টের ৩টি দরজা। প্রথমটিতে লেখা -বাঙালি খাবার, দ্বিতীয়টিতে -ইন্ডিয়ান খাবার, তৃতীয়টিতে- চাইনিজ খাবার। লোকটি সিদ্ধান্ত নিল চাইনিজ খাবারটিই খাওয়া যাক। ঢুকে পড়ল 'চাইনিজ দরজায়'। সেখানে দেখতে পেল আরো দুটি দরজা- ১. বসে খাবেন- ২. বাসায় নিয়ে খাবেন। লোকটি যেহেতু বসে খাবে তাই 'বসে খাবেন' দরজায় ঢুকে পড়ল। সেখানে গিয়ে দেখল আরো দুটি দরজা। 1.A.C. Room 2.Non A.C. Room, লোকটি চিন্তা করল একটু আরাম আয়েশেই খাওয়া যাক। সেই সুবাদে এসি রুমে ঢুকে পড়ল। এসি রুমের ভিতরে আরো দু- দুটি দরজা। ১. ফ্রীতে খাবেন ২. টাকা দিয়ে খাবেন। লোকটি খুব বেশি খুশি হলো যে, এতো সুন্দর জায়গা, এতো সুন্দর খাবার ব্যবস্থাপনা; যদি ফ্রীতে খাই তাহলে তো ভালোই হলো। তাই সে 'ফ্রীতে খাবেন' দরজায় ঢুকে পড়ল। তারপর খেয়াল করল- যেখান দিয়ে সে ঢুকেছে সেখান দিয়েই তাকে বের করে দেওয়া হয়েছে।

এখান থেকে আহরিত শিক্ষা হলো :

ক. Special জিনিসগুলো কখনোই ফ্রীতে পাওয়া যায় না। Special জিনিস পেতে হলে পরিশ্রম করতে হয়। অনুরূপ সফলতাও মূল্যবান ও স্পেশাল জিনিস। সেটা পেতে হলে অবশ্যই কষ্ট-ক্লেশ স্বীকার করতে হবে।

খ. গল্পে উদ্ধৃত লোকটি (ফ্রী-তে খাওয়ার) সুযোগে আপ্লুত হয়ে যেভাবে খাবার থেকে বঞ্চিত হয়েছে ঠিক তেমনি সফলতা অর্জনে কষ্টহীনতা ও opportunists বা সুযোগ -সুবিধার পথ খুঁজলে সফলতার রাজপথ থেকে ছিটকে পড়তে হবে।

"من جد وجد" - যে চেষ্টা করে সে (তা অর্জনে) সফল হয় একটা আরবি প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে।

আমরা স্বাভাবিকভাবে দৃষ্টি দিলেই দেখতে পাই যে, মানুষ চেষ্টার ফলশ্রুতিতে অনেক অসম্ভব ব্যাপারকে কিছুটা হলেও সম্ভবে রূপ দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ-- চাঁদকে হাতের মুঠোয় না আনতে পারলেও চাঁদের মাটিতে পদার্পণ করতে পেরেছে। পাখির মত পাখা মেলে গগণ বুকে উড়তে না পারলেও শূন্যে চলার বাহন তৈরি করেছে। মুহূর্তেই নিজের কথাকে শত মাইল দূরে থাকা মানুষটির কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে।

এগুলো কম সাফল্যের প্রতীক নয়। এসব কিছুই 'চেষ্টা' নামক বৃক্ষের সুমিষ্ট ফল।

এ কথার অনুকূলে সব কিছুই যে চেষ্টার মাধ্যমে হবে তা নয়। কতিপয় অসম্ভব বিষয় রয়েছে, যেগুলো মানুষ হাজার চেষ্টায়ও সম্পন্ন করতে সক্ষম নয়। যেমন- মৃতকে জীবিতকরণ, বৃষ্টি বর্ষণ, মাতৃগর্ভে সন্তান আনয়ন, কে কোথায়, কোন সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে এটা জানা ইত্যাদি বিষয়।

এসব বিষয় ব্যতিরেকে অন্য যেসব বিষয় সাধন করতে সমর্থ হওয়া যায় তা অর্জনে সর্বদাই আল্লাহর ওপর ভরসা ও চেষ্টার অবরোহনীতে আরোহণ করে ওপরে ওঠায় রত থাকতে হবে।

এ কারণেই বলা হয়ে থাকে- **السعي منا والاتمام من الله** 'আমরা চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু দেওয়ার মালিক আল্লাহ'।

আর চেষ্টা করলে যে আল্লাহ তা'আলা তার ফলাফল প্রদান করেন, কুরআন কারীমই তার অকাট্য প্রমাণ নির্দেশ করে।

আল্লাহ তা'আলা সূরা নাজ্‌মের ৩৯ নং আয়াতে বলেন-

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

আর মানুষের জন্য তাই প্রাপ্য, যা সে চেষ্টা করে।[৮৮]

সর্বোপরি, প্রভুর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা এটাই- তিনি আমাদেরকে সমস্ত প্রকার বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে উভয় জগতে সিদ্ধার্থকাম হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন আমীন ❑❑

[৮৮] *সূরা আন-নাজম, আয়াত : ৩৯*

নারীর ডিজিটাল পর্দা ও পুরুষের স্বীয় পর্দায় উদাসীনতা

সুরাইয়া বিনতে মামূনুর রশীদ *

'পর্দা' নারী জাতিকে আদর্শের চূড়ান্ত শিখরে আরোহণের ক্ষেত্রে অতুলনীয় ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বর্তমান নারীসমাজের পর্দার বেহাল দশা দেখে হৃদয়টা নিদারুণ কষ্ট অনুভব করে। যার ফলশ্রুতিতে কাঁচা হাতেই পাকা কাজ করার তীব্র বাসনা মানসপটে উঁকিঝুঁকি দেয়। বক্ষমাণ প্রবন্ধটিকে আমরা দু'টি ভাগে সন্নিবেশিত করেছি। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

(১) নারীর ডিজিটাল পর্দা :

'ডিজিটাল পর্দা' শব্দটা দৃষ্টিগোচর হতেই তৎক্ষণাৎ মানসপটে কিঞ্চিৎ ভাবনার উদ্ভব ঘটে। কেন এই ডিজিটাল পর্দার নামকরণ? সূচনালগ্নে তো পর্দাকে শুধু পর্দা বলেই আখ্যায়িত করা হতো; কিন্তু বর্তমানে কেন 'ডিজিটাল' শব্দের সংযোজন?

আসলে পর্দা শব্দটা তার নিজস্ব গতিতে চলমান ছিল। কিন্তু যখনই শব্দটা ছিনতাই হয়েছে, ঢুকে পড়েছে তার মধ্যে ভেজাল, তখনই তার সাথে সংযোজন করা হয়েছে 'ডিজিটাল'। তারপর সূচনা হয়েছে এর প্রকারভেদের।

উদাহরণস্বরূপ সূচনালগ্নে সরিষার তেল আপন নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু যখনই সেটাকে ভেজালের ঘ্রাণে সুসজ্জিত করা হয়েছে, তখনই তা বিভক্ত হতে শুরু করেছে খাঁটি ও ভেজালে। অনুরূপ 'হাদীস' শব্দটা সূচনালগ্নে আপন গতিতে চলমান ছিল। কিন্তু যখনই তার মধ্যে মিথ্যার অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে, তখনই তা সহীহ, যঈফ জাল ইত্যাদিতে বিভক্ত হয়েছে।

সুতরাং আজকের সমাজে পর্দা ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করেই পর্দা শব্দের সাথে ডিজিটাল শব্দ সংযোজন করা হয়েছে।

যাইহোক, মূল পয়েন্টে ফেরা যাক। ইসলামে নারীদের পর্দা করার আদেশ করা হয়েছে। কেমন পর্দা করবে নারীরা? আজকের সমাজ যেভাবে চায়, অবশ্যই সেভাবে না। বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেভাবে চান সেভাবে।

নারীদের মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে পর্দা যে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে, তা অনস্বীকার্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আমাদের বোনেরা পর্দার মাঝে খুঁজে ফেরেন বাহ্যিক স্মার্টনেস। বোরকার মাঝেই নিজেকে কমনীয়-মোহনীয় করার যারপরনাই চেষ্টা করেন। আজকের অধিকাংশ নারীসমাজ পর্দার নামে অশালীন, টাইটফিট, আকর্ষণীয়, নকশা করা, জাঁকজমক এমন সব বোরকা পরিধান করেন, যার দ্বারা তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেহাবয়ব সহজেই আন্দাজ করা যায়।

এক শ্রেণির নারীসমাজ স্বীয় আপত্তিজনক চালচলন, হাঁটাচলা, হাবভাব, চাহনি, সুগন্ধি, হাসি ও মোহনীয় কথা, এমনকি ইসলামের অপব্যবহার তথা সুরেলা কণ্ঠে কুরআন পাঠ কিংবা ইসলামী সংগীত গাওয়ার মাধ্যমে পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যতিব্যস্ত। যার ফলশ্রুতিতে পুরুষের সামান্য ক্রিয়াতেই নিজেকে সঁপে দিতে চায়। যদিও এরা একপ্রকার বোরকা পরিধান করেন। এ সকল নারী বোরকা পরেই যৌন আবেদনময়ী আচরণ প্রদর্শন করে থাকেন। যার দরুণ ব্যভিচারের ছিদ্রপথ উন্মোচিত হয়। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ব্যভিচার তো দূরের কথা, তার সূত্রপাত ঘটার সম্ভাবনা থাকে এমন দরজা বন্ধ রাখার আদেশ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

'তোমরা ব্যভিচারের ধারেকাছেও যেও না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কর্ম ও মন্দ পথ'।[৮৯]

সুতরাং হে বোন! আপনি আল্লাহর দেওয়া বিধান পালন করার ক্ষেত্রে নিজেকে প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়ে দিবেন না। পূর্ণ পর্দা করে শালীনতা বজায় রেখে চলাফেরা করুন। যৌন আবেদনময়ী প্রসাধনী এবং আচরণ থেকে নিজেকে হেফাযতে রাখুন। সফলতা আপনাআপনি আপনার কাছে ধরা দিবে ইনশা আল্লাহ।

লেখনির এ লগ্নে আল্লাহ যেন আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন,

﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

* *অধ্যয়নরত, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।*

[৮৯] *সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত :* ৩২

'তুমি কি মানুষদের সৎ কাজের আদেশ কর আর নিজের কথা ভুলে যাও? অথচ তুমি মহান আল্লাহর কিতাব পড়; তুমি কি বুঝ না?'।[৯০]

(২) পুরুষের স্বীয় পর্দায় উদাসীনতা :

'পর্দা'র কথাটা শুনলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক নারীর চিত্র। ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে যে, শুধু পর্দা নারীদের সাথেই সংশ্লিষ্ট। তার দরুণ পুরুষরা নারীদের পর্দা নিয়ে কথা বলতে বেশ মজা পান। 'নারীরা পর্দা করেন না' এর মধ্যে তাদের এলার্জি নিহিত। বিশেষ করে নারীরা কেন পরিপূর্ণ পর্দা করেন না- এ নিয়ে তাদের সারা শরীরে এলার্জি। যা মাত্রাতিরিক্ত হওয়ার ফলে চামড়া ছুলে যাওয়ার উপক্রম। অবশেষে রক্ত প্রবাহিত হয়, তবুও নিবারণের চেতনা নেই। ঠিক আছে, আপনি নারীদের সতর্ক করছেন ভালো কথা। খুবই ভালো কথা। আপনার আন্তরিক প্রচেষ্টাকে আন্তরিক মোবারকবাদ। আপনার স্ত্রী, কন্যা আর বোনকে অবশ্যই আপনি আন্তরিকভাবে বুঝাবেন। বুঝাতে হবে আপনাকেই। তা না হলে এরাই আপনার জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَلا كُلُّكُمْ راعٍ وكُلُّكُمْ مسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وولدِهِ وَهِي مسؤولةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مسؤولٌ عَنهُ أَلا فكلُّكُمْ راعٍ وكلكُمْ مسؤولٌ عَن رعيتِه.

'সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল, আর (পরকালে) নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে তোমাদের প্রত্যেককেই জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং জনগণের শাসকও একজন দায়িত্বশীল লোক, তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। আর প্রত্যেক পুরুষ তার পরিবারের একজন দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। আর স্ত্রী তার স্বামীর ঘর-সংসার ও সন্তানসন্ততির ওপর দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। এমনকি কোনো গোলাম বা চাকর-চাকরাণীও তার মুনীবের ধনসম্পদের ওপর একজন দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। অতএব, সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল, আর তোমাদের প্রত্যেককেই স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে'।[৯১]

আপনাকে একটা কথা বলি। নিজের হিসাবের কথা অবগতিতে আছে কি আপনার? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

'তোমরা কি মানুষদের সৎ কাজের আদেশ কর আর নিজেদের কথা ভুলে যাও? অথচ তোমরা মহান আল্লাহর কিতাব পড়; তোমরা কি বুঝ না?'।[৯২]

আপনার কবরে কিন্তু আপনাকেই যেতে হবে। একাই থাকতে হবে সেখানে। বিচারের মুখোমুখি একাই হবেন আপনি। প্রশ্নের উত্তর আপনাকেই দিতে হবে। মিথ্যা বলবেন? কোনো লাভ নেই। কেননা আল্লাহ আপনার মুখ বন্ধ করে দিবেন। তিনি আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর সাথেই কথা বলবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

'আজ আমরা তাদের মুখের ওপর মোহর মেরে দিব। তাদের হাতগুলো আমার সাথে কথা বলবে, তাদের পাগুলো সাক্ষ্য দেবে তারা কী কাজ করে এসেছে'।[৯৩]

আচ্ছা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যে আপনাকেও পর্দার বিধান দিয়েছিলেন, সে কথা কি মনে পড়ে না? একটু খেয়াল করার চেষ্টা করুন তো! ভালো করে খুঁজে দেখার চেষ্টা করুন! যে আয়াতে মেয়েদের পর্দার কথা বলা হয়েছে, তার পূর্বের আয়াতেই আপনার পর্দার কথা বলা হয়েছে। দৃষ্টিকে সংযত রেখে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আপনাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾

[৯০] *সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ৪৪*

[৯১] *সহীহ বুখারী, হা : ৮৯৩*

[৯২] *সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ৪৪*

[৯৩] *সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ৬৫*

'মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে'।[৯৪]

জী, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আগে আপনাকে পর্দা করতে বলেছেন, তারপর নারীদের। নারীরা পর্দা করেন না, তাই আপনি হা করে তাকিয়ে থাকেন। তাদেরকে নিয়ে নোংরা কল্পনা করেন। ওরা দেখায় তাই আপনি দেখেন। এই যুক্তিগুলো নিয়ে আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়াতে পারবেন আপনি? পারবেন না। আসলেই আপনি পারবেন না। আপনার হিসাব নেওয়ার জন্য যদি আপনাকেই মনোনীত করা হয়, আর আপনি যদি ন্যায়নিষ্ঠার সাথে বিচার করেন, তাহলে আপনিই অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ সাত শ্রেণির লোককে বিশেষ ছায়ার আশ্রয় দিবেন। যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। (তার মধ্যে এক শ্রেণি হলো) এমন ব্যক্তি, তাকে সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুন্দরী মেয়ে নিজের মনস্কামনা পূরণের লক্ষ্যে আহ্বান করে, আর সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি'।[৯৫]

কোনো নারীর আপত্তিজনক প্রস্তাবের ওপর যে যুবক বলতে পারবে, আমি আল্লাহকে ভয় করি, সেই থাকবে বিশেষ ছায়াতলে। আচ্ছা, আপনি কি এমন যুবকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছেন? হতে পেরেছেন তাদের মতো তাক্বওয়ার অধিকারী?

আপনাকে তো আহ্বান করতে হয় না। সদা-সর্বদা আপনিই অগ্রগামী হন। যার ফলশ্রুতিতে নন মাহরাম নারীকে মেসেজ পাঠান। চ্যাট করেন মেসেঞ্জারে। পর নারীর সাথে কথা বলেন মিষ্টি সুরে।

আরে আজিব তো! পর্দা যে আপনার জন্যও এসেছে, আপনাকেও যে আল্লাহ পর্দা করার আদেশ করেছেন, সেটা আপনি ভুলে যান! বাস্তবায়ন করতে চান না স্বীয় যিন্দেগীতে। নিজের খেয়ালখুশি আর অন্তরের কামনার পূজা করে একে অস্বীকার করতে চাচ্ছেন? আপনাকে আল্লাহ দৃষ্টি সংযত রাখার আদেশ করেছেন। আপনি জেনে শুনে তার আদেশ অমান্য করে তাঁকেই অস্বীকার করছেন না তো?

অস্বীকার যদি না-ই করেন, তাহলে রাস্তায় আপনার চোখ হাওয়া খুঁজে কেন? রাস্তা দিয়ে চলার সময় বোরকাওয়ালী থেকে শুরু করে পর্দাহীনা, এমনকি টিভি-সিনেমার মেয়েটার দিকেও আপনি হা করে তাকিয়ে থাকেন কেন? কী দেখেন আপনি? নিজেকে-না মুসলিম দাবি করেন আপনি? ছি!

নিজের মা, মেয়ে আর বোনকে নিয়ে রাস্তায় একদিন বের হন আর ভালো করে চারপাশের পুরুষগুলোর চোখের দিকে লক্ষ্য করুন। খেয়াল করবেন, ওই চোখগুলো তাদের দিকে কেমন করে তাকাচ্ছে? কী দেখছে? কীভাবে দেখছে? টগবগ করবে রক্ত আপনার। চোখ তুলে ফেলতে ইচ্ছা করবে তাদের। একবার ভাবুন তো! আপনি যাদের দিকে তাকান তারাও কিন্তু কোনো ভাইয়ের মা, বোন কিংবা স্ত্রী। আজ তারা উদাসীনতার কারণে ইসলাম তেমন একটা জানেন না। যার ফলশ্রুতিতে মানেন না। তাদের কবরে তারা যাবেন। কিন্তু আপনি? আপনি কি জেনেশুনে সজ্ঞানে তাদের একজন নন! যাদের দেখে আপনার রক্ত টগবগ করার উপক্রম? চোখের দৃষ্টি সংযত না করে আপনি যেনা করছেন। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

'তোমরা যেনার ধারেকাছেও যেও না। নিঃসন্দেহে এটি অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ'।[৯৬]

যেনার আশপাশে যেতে আল্লাহ আপনাকে নিষেধ করেছেন। যেনা করা তো দূরের কথা। আর আপনি? আপনি যেনা করছেন তো করছেনই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ 'চোখের যেনা হলো (যা হারাম সেদিকে) তাকানো'।

সুতরাং নিজের চোখকে সংযত রাখার প্রাণপণে চেষ্টা করুন। সফলতা আপনার পদচুম্বন করবেই করবে ইনশা আল্লাহ।

লেখনির শেষলগ্নে বলতে চাই, কথাগুলো আসলে নিজেকেই বলা। স্বীয় আত্মাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া মাত্র। তাই এই লেখাটা সবার আগে আমার জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, 'তোমরা কি মানুষদের সৎকাজের আদেশ কর আর নিজেদের কথা ভুলে যাও? অথচ তোমরা মহান আল্লাহর কিতাব পড়; তোমরা কি বুঝ না?'।[৯৭]❑❑

[৯৪] *সূরা আন-নূর, আয়াত : ৩০*
[৯৫] *সহীহ বুখারী, হা : ৬৬০*
[৯৬] *সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত : ৩২*
[৯৭] *সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ৪৪*

ফাতাওয়া ও মাসায়েল | الفتاوى والمسائل

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

প্রশ্ন (১) : *শিয়া মাযহাবের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে?*

মশিউর রহমান, তিতাস, কুমিল্লা।

উত্তর : গবেষক আলেমদের প্রাধান্যযোগ্য মতে ইয়ামানের কুখ্যাত ইহুদী আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা এই মাযহাবের বীজ রোপণ করেছে ও প্রকাশ করেছে। শিয়া মাযহাবের কিতাবগুলোতেই এ কথার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। শিয়াদের কিতাবগুলো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে, ইবনে সাবাই সর্বপ্রথম ঘোষণা দেয় যে, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই খেলাফতের জন্য একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি। শিয়াদের আকীদাহ হচ্ছে, রাসূল ﷺ-এর পরে আলীই খেলাফতের যোগ্য। এটাই শিয়া মাযহাবের মূলভিত্তি।

একদল আলেমের মতে, আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা ছিল ইহুদী। সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু'র পক্ষ অবলম্বন করে।

শিয়াদের কিতাবগুলো আরো উল্লেখ করেছে যে, ইবনে সাবাই সর্বপ্রথম রাসূল ﷺ-এর দুইজন শ্বশুর যথাক্রমে আবু বকর ও উমার এবং তাঁর জামাতা উছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুম-কে দোষারোপ শুরু করে। সেই সর্বপ্রথম আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-**এর** পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার ফিরে আসার আকীদাহ প্রচার করে।...

শিয়া আলেম আল-হাসান নুআইবাখতী বলেন, সাবাঈ তথা আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার অনুসারীরা আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু'র খেলাফতে বিশ্বাসী। তারা মনে করে, এটাকে আল্লাহর পক্ষ হতে ফরয করা দেয়া হয়েছে। শিয়াদের সাবাঈ ফির্কাটি আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার অনুসারী। সে-ই আবু বকর, উমার, উসমান এবং অন্যান্য সাহাবীদের প্রকাশ্যে গালি দেয়ার প্রথা চালু করে এবং সাহাবীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার মাযহাব প্রকাশ করে। সে বলে যে, আলী-ই তাকে এই আদেশ দিয়েছেন। অতঃপর আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে ধরলেন এবং তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে সে স্বীকার করতে বাধ্য হয়। অতঃপর আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে হত্যা করার আদেশ দিলেন।

কিন্তু সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। মোটকথা, এখান থেকেই সুন্নী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, ইহুদীদের থেকেই শিয়া ও রাফেযীদের মাযহাব গৃহীত হয়েছে।[১]

শিয়াদের সবচেয়ে বড় শাইখ সা'দ আল-কুম্মী বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার কাছে যখন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু'র মৃত্যু সংবাদ পৌঁছালো, তখন সে দাবি করেছে যে, তিনি মারা যাননি; বরং তিনি অচিরেই ফিরে আসবেন।

প্রশ্ন (২) : *আমি শুনেছি আশুরার রোযা নাকি বিগত বছরের গুনাহ মোচন করে দেয়- এটা কি সঠিক?*

ইমরান মুন্সি,ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।

উত্তর : আশুরার রোযা বিগত বছরের গুনাহ মোচন করে। দলিল হচ্ছে নবী ﷺ-এর বাণী: "আমি আল্লাহর নিকট প্রত্যাশা করছি আরাফার রোযা বিগত বছর ও আগত বছরের গুনাহ মার্জনা করবে। আরো প্রত্যাশা করছি আশুরার রোযা বিগত বছরের গুনাহ মার্জনা করবে।[২] এটি আমাদের ওপর আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ যে, একদিনের রোযার মাধ্যমে বিগত বছরের সব গুনাহ মার্জনা হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ মহান অনুগ্রহকারী।

আশুরার রোযার মহান মর্যাদার কারণে নবী ﷺ এ রোযার ব্যাপারে খুব আগ্রহী থাকতেন। ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "ফজিলতপূর্ণ দিন হিসেবে আশুরার রোযা ও এ মাসের রোযা অর্থাৎ রমজানের রোযার ব্যাপারে নবী ﷺ-কে যত বেশি আগ্রহী দেখেছি অন্য রোযার ব্যাপারে তদ্রুপ দেখিনি।[৩]

---

[১] *ফিরাকুশ শিয়া*, ১৯-২০ পৃ.
[২] *সহীহ মুসলিম*, হা : ১১৬২
[৩] *সহীহ বুখারী*, হা : ১৮৬৭

প্রশ্ন (৩) : *আশুরার দিন সিয়াম রাখার প্রকৃত ইতিহাস জানতে চাই?*

আতাউর রহমান, চাটমোহর, পাবনা।

উত্তর : ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» ، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ» ، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

"নবী ﷺ মদিনায় এসে দেখলেন ইহুদিরা আশুরার দিন রোযা রাখে। তখন তিনি বললেন : কেন তোমরা রোযা রাখ? তারা বলল : এটি উত্তম দিন। এদিনে আল্লাহ বনি ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করেছেন; তাই মুসা ﷺ এদিনে রোযা রাখতেন। তখন নবী ﷺ বললেন : তোমাদের চেয়ে আমিই মুসার অনুসরণ করার অধিক হকদার। ফলে তিনি এদিন রোযা রাখলেন এবং অন্যদেরকেও রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন।"[৪] অন্য হাদীসে জাহেলী সমাজের লোকেরাও আশুরার দিনকে সম্মান করতো এবং তারাও এদিন রোযা রাখতো।

প্রশ্ন (৪) : *আশুরার রোযা পূর্বের একবছরের গুনাহ মোচন করে দেয় এটা কি শুধু সগীরা গুনাহ মোচন করে না কি কবীরা-সগীরা উভয় শ্রেণীর গুনাহ মোচন করে?*

শফিকুল ইসলাম, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

উত্তর : কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, আশুরার রোযা এবং অন্য সৎ আমল দ্বারা শুধু সগিরা গুনাহ মার্জনা হবে। কবিরা গুনাহ বিশেষ তওবা ছাড়া মোচন হয় না। ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন : আশুরার রোযা সকল সগিরা গুনাহ মোচন করে। হাদিসের বাণীর মর্মরূপ হচ্ছে- কবিরা গুনাহ ছাড়া সকল গুনাহ মোচন করে দেয়। এরপর তিনি আরো বলেন : আরাফার রোযা দুই বছরের গুনাহ মোচন করে। আর আশুরার রোযা এক বছরের গুনাহ মোচন করে। মুক্তাদির 'আমীন, বলা যদি ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যায় তাহলে পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়... উল্লেখিত আমলগুলোর মাধ্যমে পাপ মোচন হয়। যদি বান্দার সগিরা গুনাহ থাকে তাহলে সগিরা গুনাহ মোচন করে। যদি সগিরা বা কবিরা কোনো গুনাহ না থাকে তাহলে তার আমলনামায় নেকি লেখা হয় এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। ... যদি কবিরা গুনাহ থাকে, সগিরা গুনাহ না থাকে তাহলে কবিরা গুনাহকে কিছুটা হালকা করার আশা করতে পারি।[৫]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন : পবিত্রতা অর্জন, নামায আদায়, রমযানের রোযা রাখা, আরাফার দিন রোযা রাখা, আশুরার দিন রোযা রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে শুধু সগিরা গুনাহ মোচন হয়।[৬]

প্রশ্ন (৫) : *আমি শুনেছি যে, আশুরার দিনে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু ইয়াযীদের সেনাবাহিনীর হাতে নির্মমভাবে শাহাদতবরণ করেছেন। তাই এই দিন মুসলিমদের নিকট অত্যন্ত পবিত্র। কিছু আলেমকে এই কথার প্রতিবাদ করতেও শুনেছি। দয়া করে আমাকে সঠিক বিষয়টি জানাবেন?*

মাসুদ রানা, খোকসা, কুষ্টিয়া।

উত্তর : ৬১ হিজরীর মুহাররাম মাসের দশ তারিখ তথা আশুরার দিনে হোসাইন বিন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু কারবালায় শাহাদাতবরণ করেছেন এই কথা সঠিক। এটা ইসলামের ইতিহাসের অন্যান্য ঘটনার মতোই একটি রাজনৈতি ঘটনা। যারা হোসাইনকে হত্যা করেছে, তারা ইতিহাসের সেরা যালেমদের অন্যতম। কিন্তু এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আশুরার দিনের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, এই ধারণা বানোয়াট। সেই সঙ্গে হোসাইনের শাহাদাতের ঘটনা স্মরণীয় করে রাখার জন্য মুসলিম জাতি এই দিবস পালন করার দাবিও

[৪] *সহীহ বুখারী, হা : ২০০৪*

[৫] *আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব, খণ্ড-৬*

[৬] *আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, খণ্ড-৫*

অর্থহীন। কারণ, আশুরা ও মুহাররাম মাসকে আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীন সৃষ্টির দিনই পবিত্র হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এটা চারটি হারাম মাসের মধ্যে গণ্য। যার পবিত্রতা ও মর্যাদা কারবালার ঘটনার বহু আগে থেকেই সাব্যস্ত। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মুসা আলাইহিস সালাম-কে আল্লাহ তা'আলা আশুরার দিনে ফেরাউনের কবল থেকে রক্ষা করেছেন এবং ফেরাউনকে ধ্বংস করেছেন তাই মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে এই দিন সিয়াম রেখেছেন। বনী ইসরাঈলরাও সিয়াম রেখেছে। কারবালার ঘটনার অর্ধশত বছর আগেই রাসূল ﷺ আশুরার দিন সিয়াম রেখেছেন এবং তাঁর সাহাবীদেরকে সিয়াম রাখার আদেশ দিয়েছেন। অতএব হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু আশুরার দিন কারবালায় শাহাদতবরণ করার কারণে আশুরার দিন ফযীলত ও বরকতময়, এ ধারণা বাতিল।

☞ প্রশ্ন (৬) : ***ইয়াযীদ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত?***

মানিক মিয়া, মুলাদী, বরিশাল।

উত্তর : তাফসীর, হাদীস, আকীদাহ এবং ইতিহাস ও জীবনীর কিতাবগুলো অধ্যয়ন করে যতদূর জানতে পেরেছি, তাতে দেখা যায় সালফে সালেহীনের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং অনুকরণীয় কোনো ইমামের কিতাবে ইয়াজিদের ওপর লানত করা বৈধ হওয়ার কথা আজ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি। কেউ তার নামের শেষে রহিমাহুল্লাহ বা লাআনাহুল্লাহ- এ দু'টি বাক্যের কোনোটিই উল্লেখ করেননি। সুতরাং তিনি যেহেতু তার আমল নিয়ে চলে গেছেন, তাই তার ব্যাপারে আমাদের জবান দরাজ করা ঠিক নয়। তাকে গালাগালি করাতে আমাদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছু অর্জিত হবে না। তার আমল নিয়ে তিনি চলে গেছেন। আমাদের আমলের হিসাব আমাদেরকেই দিতে হবে। তার ভাল মন্দ আমলের হিসাব তিনিই দেবেন।

ইমাম যাহাবী ইয়াজিদের ব্যাপারে বলেন : **لانسبه ولانحبه** অর্থাৎ আমরা তাকে গালি দিবো না এবং ভালও বাসবো না। মদ পান করা, বানর নিয়ে খেলা করা, ফাহেশা কাজ করা এবং আরো যে সমস্ত পাপ কাজের অপবাদ ইয়াজিদের প্রতি দেয়া হয়, তা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। তবে তাঁর চেয়ে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু যে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সুতরাং তিনি মুসলিম ছিলেন। তার জীবনের শেষ মুহূর্তে আমরা যেহেতু উপস্থিত ছিলাম না, তাই তার ব্যাপারটি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেয়াই অধিক নিরাপদ। তা ছাড়া সহীহ বুখারীর একটি হাদীসে তার ক্ষমা পাওয়ার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেখানে আছে যে, রাসূল ﷺ বলেন : আমার উম্মতের একটি দল কুস্তুনতীনিয়ায় যুদ্ধ করবে। তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। জানা যাচ্ছে, ইয়াজিদ বিন মুয়াবীয়া ছিলেন সেই যুদ্ধের সেনাপতি। আর হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু তাতে সাধারণ সৈনিক হিসেবে শরীক ছিলেন। সুতরাং ইয়াজিদও ক্ষমায় শামিল হতে পারে। আল্লাহই ভাল জানেন।

☞ প্রশ্ন (৭) : ***মহিলাগণ কি পরপুরুষের সামনে তাদের চেহারা বা মুখ-মণ্ডল খুলতে পারবে? দয়া করে জানাবেন।***

মিজানুর রহমান, দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ।

উত্তর : সবচেয়ে সঠিক মত, যা দলীল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত তা হলো, পরপুরুষের সামনে মুখ ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক। তাই একজন যুবতী মহিলা অ-মাহরাম পুরুষদের সামনে তার মুখ-মণ্ডল প্রকাশ করা থেকে বিরত রাখা আবশ্যক। যাতে দুষ্ট পুরুষদের প্রলোভনের শিকার না হয়।

তবে আলেমগণ বলেছেন যে, কোনো অজুহাত থাকলে এবং বিশেষ প্রয়োজন থাকলে মহিলাগণ অ-মাহরাম পুরুষদের সামনে মুখ খুলতে পারবে। যেমন বিয়ের প্রস্তাব দানকারী পুরুষের সামনে মহিলা তার মুখ খুলতে পারে।

সাহল বিন সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، جئت لأهب لك نفسي ، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصعّد النظر إليها وصوّبه ، ثم طأطأ رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم

يقض فيها شيئاً جلست ، فقام رجل من أصحابه فقال : أي رسول الله ، لَإن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها

"এক মহিলা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল, আমি আপনার কাছে নিজেকে দান করে দেওয়ার জন্য এসেছি। তখন আল্লাহর রসূল তার দিকে তাকালেন এবং তার দিকে তার মাথা উঁচু করলেন এবং তার তাঁর মাথা নিচু করলেন। যখন মহিলাটি তা দেখল তিনি তার সম্পর্কে কিছু বলছেন না, তখন সে বসে পড়লো। অতঃপর তার সঙ্গীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো এবং বললো: হে আল্লাহর রসূল, আপনার যদি তার কোনো প্রয়োজন না থাকে তবে তাকে আমার সাথে বিয়ে দিন।[৭] এতে বুঝা গেল, বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে মহিলার চেহারার দিকে তাকানো যাবে। অনুরূপ কেনাবেচা ও লেনদেনের প্রয়োজনে, চিকিৎসার প্রয়োজনে, সাক্ষ্য দেয়ার প্রয়োজনে, বিচার-ফয়সালার সময়, শিশু বাচ্চাদের সামনে, পরুষত্বহীনদের সামনে এবং অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজনে মহিলাগণ পুরুষদের সামনে মুখ খুলতে পারবে। অনুরূপ অতি বৃদ্ধারাও মুখ খুলতে পারবে। আর হজ্জ-উমরার ইহরাম অবস্থায় মহিলাগণ একাকী চলার সময় মুখ খোলা রাখা আবশ্যক। তবে পুরুষেরা যখন তাদের পাশ দিয়ে চলবে অথবা তারা যখন পুরুষদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তখন মাথার ওপর থেকে চেহারার ওপর কাপড় ঝুলিয়ে দিবে। তবে নিকাব পরে মুখ ঢাকবে না কিংবা হাতমোজা পরিধান করে হাত ঢাকবে না। আর ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে **إلا ما ظهر منها** এর ব্যাখ্যায় যেটা এসেছে যে, তিনি বলেছেন, মহিলাগণ অ-মাহরাম পুরুষদের সামনে চোহারা মুখ খুলতে পারবে, তা সঠিক নয়। এর আসল ব্যাখ্যা হচ্ছে তারা বাড়ির ভিতরে মাহরাম পুরুষের সামনে হাত ও মুখ খুলতে পারবে। বাড়ির বাইরে এবং পরপুরুষের সামনে তা খোলার সুযোগ নেই। অথবা এর দ্বারা বাহ্যিক পোষাক উদ্দেশ্য। পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, মহিলাদের মুখ-মণ্ডলই হচ্ছে সৌন্দর্যের কেন্দ্রস্থল, তাই বর্তমান ফিতনার যুগে মুখ-মণ্ডল ঢেকে রাখা ওয়াজিব।

[৭] *সহীহ বুখারী, ৭/১৯, সহীহ মুসলিম, ৪/১৪৩*

প্রশ্ন (৮) ***বর্তমানে অনলাইনে একটি বিষয়ে বিতর্ক চলছে। তা হলো, আল্লাহর আরশের ওপর সমুন্নত, এই কথা বলা ঠিক নয়। অথচ আমি ভারতের একজন প্রসিদ্ধ মাদানী আলেম এবং শতাধিক বইএর লেখক ও অনুবাদক শাইখ আব্দুল হামীদ মাদানীকে বলতে শুনেছি, সমুন্নত বলাতে কোনো দোষ নেই। দয়া করে বিষয়টি জানাবেন?***

আতাউর রহমান, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা।

উত্তর : আল্লাহর সিফাতের একটি উদাহরণ আল্লাহর তাঁর আরশের ওপরে সমুন্নত হওয়া। কুরআনের সাতটি স্থানে আল্লাহ তাআ'লা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আরশের ওপরে বিরাজমান। প্রত্যেক স্থানেই (استوى على العرش) "ইসতাওয়া আলাল আরশি" বাক্যটি ব্যবহার করেছেন। আর (استوى) শব্দটি এভাবে ব্যবহার হলে 'সমুন্নত হওয়া' এবং 'উপরে হওয়া' ব্যতীত অন্য কোনো অর্থে ব্যবহার হয় না। সুতরাং الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى এবং এর মতো অন্যান্য আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ সৃষ্টি জগতের ওপরে সমুন্নত হওয়া ছাড়াও আরশের ওপরে বিশেষ একভাবে সমুন্নত। প্রকৃতভাবেই আল্লাহ আরশের উপরে। আল্লাহর জন্য যেমনভাবে সমুন্নত হওয়া প্রযোজ্য, তিনি সেভাবেই আরশের উপরে সমুন্নত। আল্লাহর আরশের উপরে হওয়া এবং মানুষের খাট-পালং ও নৌকায় আরোহণের সাথে কোনো সামঞ্জস্য নেই।

সুতরাং মানুষের কোনো জিনিষের ওপরে ওঠা কোনো ক্রমেই আল্লাহর আরশের ওপরে হওয়ার সদৃশ হতে পারে না। কেননা আল্লাহর মতো কোনো কিছু নেই।

আরবী ভাষায় ইসতাওয়া শব্দের অর্থ 'সমুন্নত হওয়া' এবং 'স্থির হওয়া' ওপরে ওঠা। আর এটাই হল ইসতিওয়া শব্দের আসল অর্থ। সুতরাং আল্লাহর বড়ত্বের শানে আরশের ওপর যেভাবে বিরাজমান হওয়া প্রযোজ্য, সেভাবেই তিনি বিরাজমান। যদি ইসতিওয়ার (সমুন্নত হওয়ার) অর্থ ইসতিওলা

(অধিকারী) হওয়ার মাধ্যমে করা হয়, তবে তা হবে আল্লাহর কালামকে পরিবর্তন করার শামিল। আর যে ব্যক্তি এরূপ করল, সে কুরআনের ভাষা যে অর্থের ওপর প্রমাণ বহন করে, তা অস্বীকার করল এবং অন্য একটি বাতিল অর্থ সাব্যস্ত করল।

তাছাড়া "ইসতিওয়া" এর যে অর্থ আমরা বর্ণনা করলাম, তার ওপর সালাফে সালেহীন ঐকমত্য (ইজমা) পোষণ করেছেন। কারণ উক্ত অর্থের বিপরীত অর্থ তাদের থেকে বর্ণিত হয়নি। কুরআন এবং সুন্নাতে যদি এমন কোনো শব্দ আসে সালাফে সালেহীন থেকে যার প্রকাশ্য অর্থবিরোধী কোনো ব্যাখ্যা না পাওয়া যায়, তবে সে ক্ষেত্রে মূলনীতি হল উক্ত শব্দকে তার প্রকাশ্য অর্থের ওপর অবশিষ্ট রাখতে হবে এবং তার মর্মার্থের ওপর ঈমান রাখতে হবে।

বর্তমানে এক শ্রেণীর আলেম বলছেন, আল্লাহ তাঁর আরশের ওপর সমুন্নত হয়েছেন, এটা বলা যাবে না, বরং বলতে হবে উঠেছেন। আসলে উঠেছেন ও সমুন্নত হয়েছেন এ দু'টি বাক্যের মধ্যে পার্থক্য দেখছি না। উভয়ই ব্যবহার করা যাবে। আর আপনি আব্দুল হামীদ ফাইযী মাদানী সাহেবের কাছে যেটা শুনেছেন, সেটা ঠিকই আছে। তিনি ঠিকই বলেছেন। আর যারা বলছে, সমুন্নত হয়েছেন, এটা বলা যাবে না, আসলে তাদের এ কথা সঠিক নয়।

প্রশ্ন (৯) : ***আমি পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করি। জামাআতের সাথেও আদায় করি। বাড়িতেও আদায় করি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমি সলাতের মধ্যে আন্তরিক হতে পারছি না ও ধীরস্থিরতা পাচ্ছি না, সলাতে স্বাদও পাচ্ছি না। ধীরস্থিরভাবে সলাত আদায় করতে চাই। কিন্তু জানি না কেন জানি আমার সলাত পড়াটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। অযুতেও এমনটা হয়। দয়া করে এই অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায়টা জানাবেন ?***

মফিজুল ইসলাম, কালিয়া, নড়াইল।

উত্তর : প্রিয় ভাই ! আপনি যে অভিযোগটি করছেন, সেটা অনেক সৎকর্মশীল মুমিন-মসুলিমেরই অভিযোগ। অনেকেই অভিযোগটি করে থাকেন। আপনি সলাতে আন্তরিক হতে চাচ্ছেন, বিনয়ী হতে চাচ্ছেন এবং সলাতে শান্তি ও স্বাদ পেতে চাচ্ছেন, এটা আপনার তাকওয়া ও ঈমানদারীর পরিচয়। আশা করি আপনি আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন। কোনো সন্দেহ নেই যে, ইবাদতে মজা ও স্বাদ পাওয়া আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দার প্রতি এক বিরাট অনুগ্রহ। কেননা আল্লাহর অনুগত বান্দা তার অন্তরে আরাম, শান্তি ও অন্তরের সৌভাগ্য অনুভব করে। ইবাদত করার পরও কারো অন্তরে যদি ইবাদতের প্রতি আগ্রহ, ইবাদতে আত্মিক শান্তি, স্বাদ অনুভব না করে, তাহলে অবশ্যই তাকে এর জন্য সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এর জন্য বেশ কয়েকটি উপায় অবলম্ব করা আবশ্যক।

১) সমস্ত পাপাচার থেকে তাওবা করা ও পাপের কাজ থেকে দূরে থাকা। কারণ, পাপাচার মানুষের অন্তরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলে এবং অন্তরের নূর উঠিয়ে দেয়। ফলে বান্দা ভালো কাজে স্বস্তি ও প্রশান্তি অনুভব করে না। ইবাদত-বন্দেগীতেও স্বাদ পায় না।

২) বেশি বেশি এই দুআটি পাঠ করা উচিত।

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ.

"হে আল্লাহ! হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের ওপর সুদৃঢ় রাখো"।[৮]

৩) বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করা আবশ্যক। সেই সঙ্গে আখেরাতের কথা বেশি বেশি স্মরণ করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, **أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ** জেনে নাও, আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমেই অন্তর শান্তি পায়।[৯]

৪) বেশি বেশি রাসূল ﷺ ও সালাফদের জীবনী পাঠ করা।

৫) বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা। সেই সঙ্গে সমস্ত কল্যাণকর কাজে অংশগ্রহণ করা আন্তরিক প্রশান্তি লাভের মাধ্যম। আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

---

[৮] *সহীহ মুসলিম*

[৯] *সূরা আর-রা'দ, আয়াত : ২৮*

প্রশ্ন (১০) : ***আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে শয়তান একজন মানুষকে এমন ওয়াস্ওয়াসা (কুমন্ত্রণা) প্রদান করে যে, সে ঈমান চলে যাওয়ার আশঙ্কা করে। এ সম্পর্কে আপনার উপদেশ কী?***

উত্তর : প্রশ্নকারী যে সমস্যার কথা ব্যক্ত করলেন এবং যার পরিণতিকে ভয় করছেন, আমি তাকে বলব যে, হে আল্লাহর বান্দা! আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। উক্ত সমস্যার ফলাফল ভালোই হবে; মন্দ হবে না। কেননা এই ওয়াস্ওয়াসাগুলো শয়তান মুমিনদের মাঝে প্রবেশ করায়, যাতে সে মানুষের ঈমানকে দুর্বল করে দিতে পারে এবং তাদেরকে মানসিক অস্থিরতায় ফেলে দিয়ে ঈমানী শক্তিকে দুর্বল করে দিতে পারে। শুধু তাই নয়, অনেক সময় মুমিনদের সাধারণ জীবনকে বিপন্ন করে তোলে।

প্রশ্নকারী ব্যক্তির সমস্যাই মুমিনদের প্রথম সমস্যা নয় এবং শেষ সমস্যাও নয়; বরং দুনিয়াতে একজন মুমিন অবশিষ্ট থাকলে এই সমস্যাও বর্তমান থাকবে। সাহাবীগণও এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلُوهُ إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ. قَالَ وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ. قَالُوا نَعَمْ. قَالَ ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ.

"সাহাবীদের একদল লোক রাসূল ﷺ-এর কাছে আগমণ করে জিজ্ঞাসা করলো, আমরা আমাদের অন্তরে কখনো কখনো এমন বিষয় অনুভব করি, যা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা আমাদের কাছে খুব কঠিন মনে হয়। রাসূল ﷺ বললেন যে, সত্যিই কি তোমরা এরকম পেয়ে থাক? তারা বললেন হ্যাঁ, আমরা এরকম অনুভব করে থাকি। রাসূল ﷺ বললেন, এটি তোমাদের ঈমানের স্পষ্ট প্রমাণ"।[১০]

রাসূল ﷺ আরো বলেন,

«يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، وَلْيَنْتَهِ»

"তোমাদের কারো কাছে শয়তান আগমন করে বলে, কে এটি সৃষ্টি করেছে? কে ঐটি সৃষ্টি করেছে? এক পর্যায়ে বলে, কে তোমার প্রতিপালককে সৃষ্টি করেছে? তোমাদের কারো অবস্থা এরকম হলে সে যেন শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায় এবং এরকম চিন্তা-ভাবনা করা হতে বিরত থাকে।"

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর কিতাবুল ঈমানে বলেছেন, মুমিন ব্যক্তি শয়তানের প্ররোচনায় কখনো কুফরীর ওয়াস্ওয়াসায় পতিত হয়। এতে তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়।

প্রশ্নকারীকে আমি বলব যে, যখন আপনি বুঝতে পারবেন, এটা শয়তানের কুমন্ত্রণা, তখন তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হোন। আর জেনে রাখুন যে, আপনি যদি তার সাথে সদা-সর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন, তার পেছনে না ছুটেন, তাহলে সে আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। যেমন নবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ.

"আমলে পরিণত করা অথবা মুখে উচ্চারণ না করা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের মনের ওয়াস্ওয়াসাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।"[১১]

উপরোক্ত আলোচনার পর আমার সংক্ষিপ্ত নসীহত এই যে, ১) ওয়াস্ওয়াসার রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি নবী ﷺ-এর আদেশ মোতাবেক ওয়াস্ওয়াসা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকবে এবং আল্লাহর কাছে শয়তানের প্ররোচনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

২) বেশি করে আল্লাহর যিকির করবে।

৩) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে অধিক হারে ইবাদতে লিপ্ত থাকবে। যখনই বান্দা পরিপূর্ণরূপে ইবাদতে মশগুল থাকবে, ইনশা আল্লাহ এ ধরনের কুচিন্তা দূর হয়ে যাবে।

[১০] *মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ : অন্তরের ওয়াস্ওয়াসা*

[১১] *সহীহ বুখারী, অধ্যায়: গোলাম আযাদ করা, অনুচ্ছেদ: তালাক এবং আযাদ করার ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি প্রসঙ্গে। মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ: মনের কুমন্ত্রণা...।*

৪) এই রোগ থেকে আল্লাহর কাছে আরোগ্য লাভের জন্য আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দু'আ করবে।

প্রশ্ন (১১) : আসসালামু আলাইকুম শায়েখ। রসুলল্লাহ ﷺ একটি হাদিসে বলেছেন : যে ব্যক্তি জাম'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ পৃথক হয়ে যাবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[১২] এখানে জামা'আত বলতে কি কোনো দলের কথা বোঝানো হয়েছে? কাদেরকে জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হিসেবে গণ্য করা হয়?

আব্দুর রহমান, রুমা, বান্দরবান

উত্তর : এখানে জামা'আত বলতে আহলে সুন্নাত ও জামা'আত উদ্দেশ্য। যারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর আনিত দ্বীন ও হকের ওপর ঐকবদ্ধ হয়েছে এবং যাদের এমন একজন শাসক রয়েছেন, যার আনুগত্যের বাই'আত সম্পন্ন হয়েছে। এই জামা'আত থেকে যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যারা ইমামকে বর্জন করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সেই অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তারা জাহান্নামে যাবে।[১৩] ইমাম ইবনে রজব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইমাম আওযাঈ উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, যারা বিদ'আত তৈরি করার মাধ্যমে সুন্নী জামা'আত থেকে বের হয়ে মারা যায়, হাদীসে তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[১৪] উল্লেখ্য যে, বর্তমানে বিভিন্ন দেশে দাওয়াতী কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে শাসকবিহীন যেসব দল রয়েছে, হাদীসে জামা'আত বলতে তারা উদ্দেশ্য নয়। এসব দলের শৃঙ্খলা থেকে কেউ বের হয়ে গেলে তার ওপর উক্ত হাদীসের ধমক প্রয়োগ করা ঠিক নয়। তবে এককভাবে দাওয়াতী কাজ করার চেয়ে জামা'আতবদ্ধ হয়ে দাওয়াতী কাজ করার বিরাট উপকারিতা রয়েছে।

প্রশ্ন (১২) : আমি শুনেছি, শিয়াদের একটি ফির্কা মনে করে জিবরীল ফেরেশতা অহী নাযিল করতে গিয়ে ভুল করেছেন। তাদের মতে, অহী নিয়ে আসার কথা ছিল আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র কাছে। কিন্তু তিনি ভুলক্রমে নিয়ে গেছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে। কারণ, মুহাম্মাদ ﷺ ও আলীর মধ্যে শারীরিক মিল ছিল।

উত্তর : শিয়াদের একটি সম্প্রদায় মনে করে, মুহাম্মাদ ﷺ আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র সাথে এমন সাদৃশ্য রাখতেন, যেমন একটি কালো কাক আরেকটি কালো কাকের সাথে সাদৃশ্য রাখে। তাই আল্লাহ তা'আলা যখন জিবরীল ﷺ-কে অহী নিয়ে আলীর কাছে যেতে বললেন, তখন জিবরীল ভুল করে মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর নাযিল করে ফেলেছেন। শিয়াদের এই সম্প্রদায়কে গুরাবীয়া সম্প্রদায় বলা হয়। আসলে গুরাবীয়া সম্প্রদায় ও বর্তমানে ইরানের ক্ষমতাসীন রাফেযী সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ইরানের ক্ষমতাসীন এই রাফেযী সম্প্রদায় মনে করে, মুসলিমদের হাতে বর্তমানে যেই কুরআন রয়েছে তা কেবল মূল কুরআনের নয়ভাগের একভাগ। বাকী অংশের ইলম আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে রয়ে গেছে।[১৫]

বর্তমানে ইরানের ক্ষমতাসীন শিয়াদের ইমামীয়া সম্প্রদায় আলীকেই রাসূল মনে করে। তারা এটা বলতে চায় না যে, জিবরীল ভুল করেছেন। তারা বলে যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর দায়িত্ব ছিল শুধু আলীকে পরিচয় করিয়ে দেয়া এবং শুধু আলীর জন্যই কুরআনের ব্যাখ্যা করা।

প্রশ্ন (১৩) শিয়াদের কাছে তাদের ইমামদের কথার মূল্য কতটুকু?

জায়েদ, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ

উত্তর : শিয়াদের শাইখরা, তাদের ইমামদের কথাকে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের কথার সমান গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তারা বলে, আমাদের প্রত্যেক ইমামের কথাই আল্লাহর কথা। আল্লাহর কথার মধ্যে যেমন কোনো বৈপরীত্য নেই, তেমনি আমাদের ইমামদের কথার মধ্যে কোনো মতভেদ নেই।[১৬]

শিয়াদের ইমাম খোমাইনী বলেন, নিশ্চয়ই ইমামদের শিক্ষা কুরআনের শিক্ষার মতোই। ইমামদের কথা কুরআনের কথার মতোই। অতএব ইমামদের কথা বাস্তবায়ন করা ও অনুসরণ করা আবশ্যক।❑❑

---

[১২] *মুস্তাদরাকে হাকিম, হা : ৪০৭*
[১৩] *শারহু মুসলিম, ১২/২৩৮*
[১৪] *ফতহুল বারী, ১/৫৯*
[১৫] *আল-মানিয়াতু ওয়াল আমাল, ৩০ পৃ.*
[১৬] *শরহু জামে, (২/২৭২)*